মাটির মাশুল

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিমলারঞ্জন প্রকাশন
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

প্রকাশক—বিমলারঞ্জন চন্দ্র
বিমলারঞ্জন প্রকাশন
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

—দুই টাকা বারো আনা—

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস
৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কয়েকটা গল্প কয়েক বছর আগে লেখা। অন্য গল্পগুলি, যেমন 'আপদ' 'বাগ্দীপাড়া দিয়ে···' ইত্যাদি এই বছরের মধ্যেই লেখা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
আশ্বিন, ১৩৫৫

মাটির মাশুল

ভোরে আজ চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। অল্প দূরেও নজর চলে না। এমনি কুয়াশায় রাত্রি শেষ হয় আজকাল, সারাদিন রোদ ভোগের পর আবার হিম হিম কুয়াশার যেন আভাষ মেলে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। ভোরের কুয়াশা কাটতে বেলা হবে, তখন দেখা যাবে চারি দিকে মাটি ঢেকে গেছে আগামী ফসলের তরুণ সবুজ চাবায়। ছড়ানো বীজ থেকে এলোমেলো ভাবে জন্মেছিল শিশু, গোছায় গোছায় সাজিয়ে রোপণ করেছে চাষী। সারা দিন কাঁচা সবুজ শীষগুলি বাতাসে দোলে। নবাগত উত্তুরে বাতাস এখনো খেয়ালী, চপল। থেকে থেকে হঠাৎ থেমে যায়, বায়ু বয় পূব থেকে, তা-ও আবার হঠাৎ দিক্ পরিবর্ত্তন করে বইতে সুরু করে দখিণা হয়ে! ধানের শীষ টিপলে এখন দুধ বেরোয়, উপোসী মানুষ মাদের স্তনের দুধের চেয়ে ঘন, বুঝি বা মিষ্টিও। চাষীরা বলে যে তা হবে না কেন, মানুষ-মায়ের বুকে দুধ তো আসে মাটি-মায়ের দানা-বাঁধা এই দুধ খেয়েই।

বাপ রে, কি কুয়াশা। ভুঁই ফুঁড়ে মেঘ উঠেছে মন করে যেন।

ভুবণ বলে রসিক আর তোরাব আলিকে। দাওয়ায় বসে চেনা যায় না বিশ-পঁচিশ হাত দূরে মাটির রাস্তায় কে হেঁটে যাচ্ছে, এদিকের ডোবা থেকে উঠে আসছে কোন বাড়ীর বৌ।

মাটির মাশুল

রসিক বলে, ধরণী ব্যাটা ঘুমোবে বেলা তক্। একটু দেরী করেই রওনা দি' মোরা, না কি বল মিঞা?

রসিক ভূষণের বোনাই, পাড়াতেই খানিক তফাতে তার ঘর। তোরাব এক রকম প্রতিবেশী ভূষণের, দু'জনের বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা বাঁশ-ঝাড় আর কয়েকটা কুল গাছের।

দেরী হয়ে যাবে না? কোন একটা ছুতা করে আজ যদি কর্জ্জা না দেয় ধর?

তোরাব বলে উদ্বেগের সঙ্গে। ধরণী তরফদার ধান কর্জ্জা না দিলে কাল-পরশু ওদের দু'জনের ঘরেও উপোস সুরু হয়ে যাবে কিন্তু তোরাব আলির ঘরে গত কাল থেকেই এক দানা চাল নেই। উপোস চলছে।

ভূষণ বলে, দেবার মতলব না থাকলে রাত থাকতে গিয়ে ধন্না দিলেও দেবে না। মতলব থাকলে যখনি যাও মিলবে।

সে কথা ঠিক।

আগেকার দিনে ধরণীর কাছে কর্জ্জ চাইতে যাবার দরকার হলে এরাই হয়তো এক জন চুপি-চুপি আরেক জনের আগে গিয়ে নিজের জন্য কর্জ্জটা আগে-ভাগে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ চাষীরা প্রায় সকলেই টের পেয়েছে ওতে কোন ফল নেই, কে আগে এল তোষামুদে কথা কইল বা কান্নাকাটি করল সে সব বিচার করে না ধরণী তরফদার। যাকে না দেবার তাকে কিছুতেই দেয় না, যাকে দেবার তাকে দেয়, সমান বাঁধনে বাঁধে। ভাণ্ডারও তার অফুরন্ত, তার কাছে কর্জ্জ বাগানো মন্বন্তরের রিলিফখানার খয়রাত পাওয়া নয় যে আগে গিয়ে মারামারি কামড়াকামড়ি না করলে ফুরিয়ে যাবার ভয়। তবে কি না আজও না খেয়ে থাকতে হলে তোরাবের বিশেষ মুস্কিল আছে। বৌটা তোরাবের আসন্ন-প্রসবা, বড় কমজোরী হয়ে পড়েছে শরীরটা

তার এমনিতেই। সব জেনে বুঝেও উদ্বিগ্ন মনটা তাই ধৈর্য্য মানে না, সাধ যায় ছুটে গিয়ে অন্তত: যাচাই করে আসতে যে বৌটা আজ একটু ভাত পাবে কি পাবে না।

দেড় ভাগি চাপাবে ঠিক। না তো কর্জ্জা দেবে না মন করে।

তা মানবো না মোরা।

না, তা মানবো না, আল্লার কিরে!

এক মুহূর্ত্তে তোরাব যেন ভয়-ভাবনা-উদ্বেগ সব ভুলে যায়, হাঁটুতে জোর চাপড় মেরে বলে, পোয়া সুদের এক কুণো বাড়তি মানব না, না দেয় কর্জ্জ না দেবে।

গত বছর ফসল কাটার দশ-বার দিন আগে বিপদে পড়ে দেড় ভাগি সর্ত্তে তোরাবকে ফজলু মিঞার কাছে, ধান নিতে হয়েছিলো সে জ্বালা আজও সে ভোলেনি। বর্ষাকালে ধান কর্জ্জ মেলে দেড় ভাগিতে, ফসল ঘরে উঠলে দেড় গুণ শোধ, দেবার সময় তবু ভাবা চলে যে এতগুলি মাস ঋণটা ভোগ করা গেছে। এখন ফসল কাটতে আর মাসখানেকও বাকী নেই আজ ও-সর্ত্ত চাপাতে চাওয়া তো দিনে ডাকাতির সামিল।

চলো মিঞা দেখি অদেষ্টে কি আছে। গরজ তো মোদের, ও ব্যাটার কি? কলকেতে সুপারির মত ছোট একগুলি তামাক দিয়ে হাতের তালুতে নারকেল ছোবলা পাকাতে পাকাতে রসিক বলে।

বটে না কি? তাই ভাবলে তুমি? ভূষণ বলে: ব্যঙ্গের সুরে, ও ব্যাটার কি? কর্জ্জ না দিলে ওর ঘরের ধান ঘরে রইবে, বাড়বে এক দানা? উয়ার কারবার এই, মোদের চেয়ে উয়ার কর্জ্জ দেবার গরজ বেশী ছাড়া কিছু কম নাই।

ঠিক। গুঁটি মেরে বসে থাকে মোদের খেলাতে, তোরাব বলে, মোরা হার মানি, নয় তো—

মাটির মাশুল

কুয়াশা নড়ে না, হাল্কা হয় না। চালা থেকে টপ-টপ জল পড়ছে। হাত বদল করে তারা কল্কেতে কয়েকটা ছোট-ছাট আর একটিমাত্র বড় টান দিয়ে তামাক খায়, চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। বাসনে ঘা দিয়ে বাজাবার আওয়াজ আসে অন্দর থেকে, এইভাবে চিরদিন ভেতরের ডাক আসে ভূষণের। ছেলেটার জ্বর এসেছিল পরশু, কাল রাত্রে খুব বেড়েছিল জ্বরটা, গা যেন তপ্ত খোলার মত পুড়ে যাচ্ছিল। এখন খুব ঘাম দিয়ে তাড়াতাড়ি জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে, ছেলেটা ছটফট করছে গোঙিয়ে গোঙিয়ে। ছেলের কাছে একটু বসে ভূষণ উঠে আসে। তার মুখ আরও কালো আর গম্ভীর দেখায়।

হাসপাতালে যাবে না একবার? তার বৌ শুধায়।

হাঁ, হাসপাতাল হয়ে ফিরব।

সে ছাড়া বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই ভূষণের, পাঁচটি শুধু স্ত্রীলোক। সব ঝঞ্ঝাট সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয় একা।

বাইরে এসে সেই এবার গরজ করে বলে, চলো রওনা দি, বসে থেকে কি লাভ?

এই সোনামাটি গাঁয়েরই দীঘিপাড়ায় ধরণী তরফদারের টিনের ঘর আর দালান-কোঠায় মেশানো বাড়ী। ভূষণের বাড়ী থেকে প্রায় আধ ক্রোশ তফাতে। রাস্তায় তারা নাগাল ধরে পিনাক সামন্তের, সে-ও কুয়াশা ভেদ করে গুটি-গুটি হেঁটে চলেছে তরফদারের বাড়ীর উদ্দেশে। এমনি অভাব চারিদিকে যে সবারি যেন গতি ওই একদিকে যেখানে একজনের খামারে গুদামে ধান গাদা হয়ে জমে আছে। মানুষটার বয়স যে খুব বেশী তা নয়, অকালে বুড়িয়ে জীর্ণ আর বাঁকা হয়ে গেছে সত্তর

বছরের বুড়োর মত। শোনা গেল, তরফদারের কাছে তার প্রয়োজন ধান কর্জ্জ নেওয়া নয়, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এক চোরাগোপ্তা এক-তরফা মামলায় জমি নীলামের নোটিশের প্রতিবাদে কাকুতি-মিনতি করা যদি কিছু সুরাহা হয়। তার ছেলে কৈলাস গেছে বিদেশে খাটতে, ফসল কাটার সময় আরও নিকট হলে ফিরবে, এ সময় আচমকা এই বিপদ ঘটায় কি করবে ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পিনাক সামন্ত।

বলে, মরণ হলে হাড় জুড়াত, অদেষ্টে মরণ নাই। না ভাই, অদেষ্টে মরণ লেখেনি মোর। সেই যে গোল বাধালে কৈলেস, নাথুর হয়ে সাক্ষী দিলে ঘর জ্বালানোর মামলায়, সে রাগটা ঝাড়লে তরফদার।

বলে, মোর ক্ষেমতায় কুলোয়? ছুটোছুটির শক্তি আছে? মরে মরে বেঁচে রই শুধু মন্দ অদেষ্ট বলে।

সবাই জানে সব, বোঝেও সব। আস্তে পা ফেলে পিনাকের সাথে গতি মিলিয়ে তারা হাঁটে। ধরণীকে গিয়ে ধরে পড়লে যে কিছু হবে না এ জানা কথা। ভাঙা জীর্ণ শরীর নিয়ে ছুটোছুটি করে পিনাককেই ঠেকাতে হবে নীলাম, লড়তে হবে মিথ্যে মামলা ফাঁস করতে, অবশ্য যদি সে লড়ে, লড়তে পারে। কৈলাস এসে কেঁদে-কেটে মাপ চেয়ে নাকে খত দিলে বড় জোর আপোষ হবে একটা, দয়া করে কিছু কমে সমে রেহাই দেবে ধরণী। নয় তো যাবে জমি নীলাম হয়ে। এ তো জগতে হরদম ঘটছে।

ভূষণ শুধায়, কৈলাসের শ্বশুর না মর-মর হয়েছিল?

মরল কৈ? পিনাক বলে দারুণ হতাশায়, যে মরলে ভাল সে কি মরে? উয়ার মরণ নাই, মোর মরণ নাই, মোরা চিরজীবি হয়ে রইব!

কৈলাসের শ্বশুরের দু'টি মাত্র মেয়ে, সে মরলে তার জমি-জমা ঘর-

জুয়ার ভাগাভাগি করে মেয়েরা পাবে। তার অসুখ-বিসুখের খবর পেলেই জামাই দু'জন দেখতে ছুটে যায়, এমনিও যায়। পূজার পর তাকে কঠিন রোগে পেড়ে ফেলেছিল, সকলেই আশা করেছিল এবার তার ভব যন্ত্রণার পালা শেষ হবে। কিন্তু বুড়ো আবার বেঁচে উঠেছে।

পিনাকের সঙ্গে হেঁটে দীঘিপাড়ায় পৌছতে পৌছতে কুয়াশা খানিকটা হাল্‌কা হয়ে আসে, এবার তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। দীঘিপাড়ায় ঘন বসতি, টিন বা খড়ের চালার বাড়ীই বেশী, দালানও এখানে ওখানে চোখে পড়ে। সোনামাটির এই দীঘিপাড়া ও কুয়াতলাতেই গাঁয়ের স্বচ্ছল সম্পন্ন এবং গরীব অধিকাংশ ভদ্র গৃহস্থের বাস। দীঘিপাড়াতে বড় জোতদার আছে আরও দু'জন, তবে ধরণীর মত বড় কেউ নয়, ওদের দু'জনের মিলিয়ে যত হবে তার চেয়ে বেশী মাটি ও বেশী চাষীর সে ভাগ্যবিধাতা। পশ্চিমে কিছু তফাতে বুড়ো বটগাছটার খানিক আড়ালে ইন্দু শাসমলের বাড়ীর সামনেও কর্জ্জপ্রার্থী চাষী কয়েক জন জমা হয়েছে দেখা যায়। অন্য জোতদার আশু পট্টনায়কের বাড়ীটা আড়ালে।

ধরণী তখনো দর্শন দান করেনি, তবে আর খুব বেশী দেরী যে তার হবে না অন্দর থেকে সদরে আসতে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তক্তপোষের ফরাস ঝেড়ে বাঁধানো হুঁকোটা রেখে গেছে কানাই, বুড়ো লোচন সরকার চোখে চশমা এঁটে গেরো বাঁধানো খাতা খুলে বসেছে, ধরণীর ভাগ্নে আচমকা এসে উঁকি দিয়ে গেছে।

অনেকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল, প্রায় তাদের সাথে সাথেই ভিন গাঁয়ের আরও দু'জন এল। তাদের মধ্যে রাজেন দাসকে দেখে একটু অবাক লাগে সকলের, তার অবস্থা ভাল বলেই জানত সকলে, বছরের কোন সময়ে ভাতের অভাব হয় না। ধান

মাটির মাশুল

কর্জ্জ চাইতে এসেছে রাজেন দাস, না টাকা? যেমন বিপন্ন ভাব তার, কারো দিকে না তাকিয়ে যে ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পেতে রেখেছে কদম গাছটায়, দেখে মনে হয় অনুগ্রহই বুঝি চাইতে এসেছে যে কাজটা তার মোটে অভ্যস্ত নয়। কান্নু আর ফকিরই বা কেন এসেছে কে জানে? নিঃস্ব পথের ভিখারী হয়ে গেছে দু'জনেই ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হয়ে, এক কাহন খড়ও নেই যে ওদের কোন দয়া করে ধরণী সুদে আসলে ফিরে পাবার প্রত্যাশা করতে পারবে।

পরস্পরের মধ্যে কথা চলতে থাকে ধীরে ধীরে, নতুন কিছু জানার বা বলার থাকলে জিজ্ঞাসা ও জবাব, দু'-একটি শব্দে আপশোষ বা সমবেদনা প্রকাশ। প্রাণখোলা কুশল প্রশ্নের পালায় মন্দা এসেছে। চিরকালের স্থায়ী দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা কেউ বলাবলি করে না, কারণ কারো অজানা নেই কার দুর্ভোগের জের চলছে তো চলছেই, সে হিসাবে সবাই তারা সমান দুর্ভাগা, কম-বেশী যদি হয়তো সেটা সাময়িক, জোয়ার-ভাঁটার খেলা মাত্র। আজ যে দুদিনের অন্ন সংস্থান করেছে, দুদিন বাদেই তার উপোস। রাজেন দাস পোড় খায়নি, তার লজ্জা করতে পারে। ঘরে অন্ন না থাকাটা দশ জনের জেনে ফেলার মধ্যে যে লজ্জার কিছু থাকতে পারে, অপৌরুষের বা অপদার্থতার প্রমাণ সেটা, অন্যেরা তা বহু কাল আগেই ভুলে গেছে!

ভূষণের জিজ্ঞাসার জবাবে রাজেন দাস একটু কাঁচু মাচু হয়েই বলে একটু কাজে এয়েছি। দরকার আছে একটা।

দরকার ছাড়া কেউ যেন এখানে আসে!

শ্রীনাথ মাইতি বলে, আর দাদা, কপাল! মলজোড়া ফের বাঁধা দিতে এয়েছি, ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

বলাবলি যা হয় সব চাষাড়ে কথা। হাটে হাটে ধান-চালের

লাটসাহেবী দর, কেমন হবে এবারের ফসল, ভাগ, আবোয়াব আদায়, জুলুম ইত্যাদির কথা। আর সেদিন রামপুরে পত্তনিদার মদন শাসমলের লোকের সঙ্গে চাষীদের যে মারামারিটা হয়ে গেল সেই আলোচনা। রাখাল একটা নতুন খবর দিয়েছে আজ, মদন শাসমলের ভাইপো না কি জখম হয়েছিল দাঙ্গায়, হাসপাতালে মারা গেছে। তার চেয়েও জবর একটা খবর শুনে এসেছে তিনু, সত্য কি মিথ্যা জানে না। হাঙ্গামার পর পুলিশ এসে রামপুরে ধর-পাকড়-জুলুম চালাচ্ছিল, হঠাৎ না কি পুলিশ চলে গেছে গাঁ ছেড়ে। একেবারে হঠাৎ, সকালেও দলকে দল পুলিশ হাজির ছিল, বেলা খানিক বাড়তে না বাড়তে মার্চ্চ করে চলে গেল ষ্টেশন রোডের দিকে। তিনুর এই অদ্ভুত কাহিনী নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে। সবাই যে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবে তার সময় পাওয়া গেল না। ধরণী এল বৈঠকখানায়।

বলল, বেশ, বেশ। তোমরা এয়েছ দেখছি। তা বেশ, তা বেশ। জয় দুর্গা শ্রীহরি। তামাক আনতে বুড়ো হলি শালার পুত্?

ঘরের মধ্যেই ভেতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কানাই কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছিল, নজর পড়ায় ধরণী বলল, এই যে এনেছিস্!

একেবারে যে মোটা গোল-গাল তা নয়, নাদুস-নুদুস চেহারা ধরণী তরফদারের, বেঁটে বলে মোটা দেখায় বেশী। টানা চোখ, মুখখানা থ্যাবড়া না হলে অপরূপ মানাত, আর যদি ভুরু না হত দামাল মোচের মত ঘন। টানা চোখে একবার সে তাকিয়ে নেয় সবার দিকে, কে কে এসেছে, কেন এসেছে, মোটামুটি আন্দাজ করে নিতে। দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে, এক দিন সকালে বৈঠকখানায় নেমে যদি ত্যাখে যে এক দল আধিয়ার হাতিয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছে, মোটেই সে আশ্চর্য্য হবে না। ব্যবস্থা অবশ্য সে করে রেখেছে

আত্মরক্ষার। দু'নলা বন্দুকে ছর্রা টোটা ভরে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের দরজার ওপাশে, রামদা' নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে রঘু আর বিষ্ণু। তাছাড়া, লোক-জন সকলকে বলাই আছে যে, বৈঠকখানায় একটু হট্টগোল শোনামাত্র যে যেখানে থাকে ছুটে আসবে দা' লাঠি যা পায় হাতের কাছে তাই নিয়ে।

তবু, বলা যায় না। সব সময় মনে একটা আতঙ্ক জেগে থাকে। যা দিন-কাল পড়েছে।

রাজেন যে? খবর কি? রাজেনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হুঁকো টেনে লোকটা যে কে চিনবার যথাসাধ্য চেষ্টার পর আচমকা ধরণী প্রশ্নটা করে বসে। ধরণী তার জন্ম থেকে চেনা।

একটু দরকার ছিল।

বোসো। জয় দুর্গা শ্রীহরি। হাই তুলে তুড়ি দেয় ধরণী, শরীরটা ভাল নেই।

হুঁকো টেনে যায় ধরণী, আর্দ্ধেক চোখ বুজে, চুপচাপ। বিষয়-কর্ম্মে তার যেন মন নেই, এতগুলি লোক কেন তার কাছে এসেছে সে যেন জানতেও চায় না, পরম গভীর কোন এক অপার্থিব চিন্তায় সে যেন ডুবে গেছে।

নিজে থেকে সে কিছু বলবে না, তার গরজ নেই, এ জানা কথা। তোরাব একটু সামনে এগিয়ে বলে, মোরা কর্জ্জের জন্য এয়েছিলাম কত্তা।

কর্জ্জ? তা বেশ। ফজলু মিঞার খবর কি?

তেনা ভাল আছেন। তা, তেনা কাত্তিকে দেড় ভাগি আপোষ চান তাই আপনার কাছে এয়েছি।

বটে? তা বেশ। কাত্তিকে দেড় ভাগি অন্যায় জুলুম বটে।—ধরণী

যেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে এসেছে হঠাৎ, মুখটা দেখায় গম্ভীর।
—লোচন, ধান কি আছে কর্জ্জ দেবার মত ?

কিছু আছে। অল্প-স্বল্প দেয়া যায়।

তখন ধরণী বলে, শোন বলি, কাত্তিকে দেড় ভাগি চাইব না আমি, আমার বাপু বিবেক আছে। ও-সব গোলমালে কাজ নেই। ধানের বাজার-দরে ধান দেব, টাকায় সুদ ধরব—ধরণী গলা খাঁকরায়, সুদখোর মহাজন হলে চার আনা ধরত, আমায় দু'আনা দিও, তাই ঢের।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় উপস্থিত সকলে। সকলে মরিযা হয়ে প্রাণপণে নাড়া-চাড়া করে প্রস্তাবটা মনে মনে। বোকা চাষা-ভূষো মানুষ, মানে বুঝেও ভাববার চেষ্টা করে কথাটার যে মানে বুঝেছে তা হয়তো ভুল, অন্য মানে আছে।

তোরাব বলে, কত্তা ?

রাজেন দাস বলে, এটা কি বলছেন ?

কেন ? ধরণী যেন আশ্চর্য্য হয়ে যায়, দেড় ভাগিতে মণে আধ মণ সুদ দিতে হত তোমাদের, টাকায় আট আনা। আমি কি চামার, মাসে আট আনা সুদ চাইব ? চলতি দরের হিসেবে টাকার খতে ধান নাও, দু'আনা সুদ দেবে, টাকায় বা ধানে যা তোমাদের খুসী।

ধানে শোধ দিলে— ? সংশয়ভরে প্রশ্ন করে এক জন।

ধানেই দিও, নির্ব্বিকার ভাবে বলে ধরণী, টাকায় দু' আনা সুদ ধরে দর হিসেবে ধানেই দিও।

এবার জ্বালা বোধ করে, সকলে। এতই বোকা ঠাউরেছে তাদের ধরণী তরফদার ? আজ ধানের দর কোথায় ফসল ওঠার আগে, ফসল উঠলে তা কোথায় নেমে যাবে। দু'আনা সুদ !—বিনা সুদে এই কড়ারে

ধান কর্জ্জ না নিলে দেড় ভাগি হিসাবেরও অনেক গুণ বেশী ফিরিয়ে দিতে হবে ধরণীকে। ব্যাটা ধড়িবাজ ডাকাত!

ভূষণ বলে, আজকের চোরাবাজারি দরে মোরা ধান নিতে পারি কত্তা?

তবে দেড় ভাগি হিসেবে নাও।

পুলিন জানা যেন হাঁফ ছাড়ে, ধরণীর চলতি দরের হিসাবে কর্জ্জ দেবার প্রস্তাব শুনে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

তাই দেন কত্তা, তাই দেন।

রও দাদা, রও। তড়ফিও না অত।—তোরাব বলে ধমক দিয়ে, দেড়া ভাগির কর্জ্জ মোরা ছোঁব না কেউ।

২

শীত পড়ছে অল্পে অল্পে। সকাল-সাঁঝে গায়ে কাঁটা দেয়, কাপড়ের খুঁট বা আঁচল বা গামছাখানি ভাল করে গায়ে জড়াবার তাগিদ আসে। রুক্ষ চামড়ায় খড়ি ওঠার সূচনা দেখা দিয়েছে সকলের, কারো কারো খুব স্পষ্ট, গা চুলকোবার ফলে। চাষীর চামড়ায় স্নেহ এক-রকম না থাকার মধ্যেই চিরকাল, ক'বছর তাতেও বিষম ঘাঁটতি পড়ে চলেছে। স্নানের ঘাটে অল্পবয়সী মেয়ে-বৌরা গা ঘষতে ঘষতে বলে অসন্তোষের সুরে, দুৎ, কি সুরুৎ হতেছে দিন দিন, মরে যাই। বেশী রাতে শীত পড়ে বেশী। সকাল-সাঁঝে বাতাস বয় না, কুয়াশা হয়, শীতের বাড় ঠেকে থাকে। সাঁঝের কুয়াশা হাল্কা, দূরের আলোও দেখা যায়, উজ্জ্বল বিন্দুর বদলে ঝাপসা আলোয় ঢাকার মত। দু'-একটা চোখে পড়ে এদিকে ওদিকে, আলো বেশী জ্বলে না গাঁয়ে। বোমার ভয়ের আইন নেই, কিন্তু তেলের অভাব।

দাওয়ায় একটা প্রদীপ জ্বালিয়েছে ভূষণ, এতগুলি লোকের আসরে

মাটির মাশুল

একটু আলো ছাড়া চলে না। সরু সলতের ডগায় ক্ষীণ মুমূর্ষু শিখাটি জ্বলছে, সতর্ক নজর রেখেছে ভূষণ, মাঝে মাঝে একটু উস্কে দিচ্ছে সলতেটা। সে আলো যেন ছায়াপাত করেনি মাটির দেয়ালে চাটাই-এ বসা জ্যান্ত মানুষগুলির, কোন মতে শুধু চিনিয়ে দিতে পারছে চেনা মুখগুলি। অন্দরের আঁধার থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের ছাড়া ছাড়া কথার আওয়াজ আর থেমে থেমে সুরবালার বিনিয়ে কাঁদার সুর। সেই বুঝি একা একটু শোক করছে ছেলের জন্য, ভূষণের বাড়ীতে যদিও স্ত্রীলোক মোট পাঁচটি। সুরবালার তবে তীক্ষ্ণ গলাও ঝিমিয়ে মিইয়ে অস্ফুট হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। পুত্রশোকও জলো হয়ে গেছে মানুষের শোকে শোকে, এমনই তো বছর প্রায় ঘুরত না মড়া-কান্না না কেঁদে, তার ওপর লাঠি গুলি বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী যদি জোট বেঁধে এসে কাঁদাতে চায় অবিরাম, একটার বদলে এক সাথে দশটা মরণের ঘায়ে বুক ফাটিয়ে, কাঁহাতক শোক করতে পারে মানুষ। তা ছাড়া আছে যত কিছু সয় না তার সব সয়ে বাঁচা। পাথর নয় বলেই বুক ফাটেনি সত্যি কিন্তু তাই বলে পাথর হতে তো বারণ নেই বুকের।

মোহন গিয়েছিল একটু তামাক চাইতে প্রতিবেশী বটুকের কাছে। ফিরে এসে বলে, বটুক খুড়োর তামাক নেই।

—এক ছিলুম নেই? এক ছিলুন দিলে না? হতাশার রাগে গলা চড়ে যায় ভূষণের।

—বললে তো কাল থেকে তামাক ফাঁক। তামাক টানতে টানতে বলল।

—অ। ব্যাটা কঞ্জুস!

—আর বলল কি শুনবে দাদা, উপোস পেটে তামুক খেলে রক্তবমি

হয়, বলগে যা মোহন তোর ভাইকে ঠেসে গাঁজা টানুক, সিদ্ধি পাবে। হাসি কি, ঠিক যান শালের গলায় কাসি ঠেকছে।

—ওটা বেজন্মা, বজ্জাত। ছেলের বৌটাকে ঘর ছাড়ালে।

—ইন্দ্র ফুসলেছে না?

—ফুসলেছে, অমন ফুসলায়। কে কোথায় ফুসলায় আর ওমনি ঘর ছাড়ে ঘরের বো না কি বটে? কারো ঘরে মেয়ে-বৌ রইত না তা'লি। খেতে দিত না তো কি করবে ঘর না ছেড়ে?

—তা ফের ভাতের ঘাটা নেই বটকের।

তামুক ছাড়া জমে না।—আরেক বার আপশোষ করে ভূষণ। ছেলের মরণে সে যেন তেমন কাতর নয়, তামাকের জন্ম আপশোষটা বেশী। বিশেষ করে রাজেন দাস আজ যেচে এসে তার দাওয়ায় বসেছে বলে। মাননীয় ব্যক্তির পদার্পণে ধন্য হয়ে তাকে খাতির করার সাধ মেটানো গেল না বলে নয়. মানে তারা সমানই হবে, বয়সেও প্রায় সমান। সাপ বেজীর সম্পর্ক ছিল তাদের অনেক কাল। রাজেনের বোন সুখদা, ছেলেপিলে নিয়ে আজ সে সাত বছর ঘর করছে শিয়াপোলের অনন্তের, তাকে ভূষণ বিয়ে করেনি কথাবার্ত্তা পাকা হবার পর, এই ছিল ঘটনা। ঘাটের পথে সাঁঝের বেলা একলা সুখদাকে নিমাই ছোঁড়ার সাথে কথা কইতে দেখেছিল, হেসে হাত নেড়ে কথা কইতে দেখেছিল ভূষণ নিজের চোখে—এই ছিল কারণ। সেও কথা কইতেই গিয়েছিল নিজে, দু'টো মিষ্টি মিষ্টি প্রাণের কথা। কথা আর বলা হয়নি। খটকা একটা এমনিই ছিল ভূষণের মনে যে তার সাথে লুকিয়ে ভাব করতে পারে যে মেয়েটা সে কি আর অন্যের সাথে পারে না? এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাবটা হয়েছে তারই সাথে, কিন্তু কথা হল, স্বভাব ভাল যে মেয়ের সে তো এ রকম

ভাব-সাবের ব্যাপার করে না কারো সাথেই। যে খুঁতখুঁতানি মনে ছিল সেটা প্রত্যয় হল হেসে হেসে নিমাই-এর সাথে হাত নেড়ে কথা বলা দেখে, বাঁশ-ঝাড় গাছ-পালায় ঘেরা যে নির্জ্জন স্থানটিতে শুধু তারই সাথে কথা বলার কথা সুখদার। বিয়ে তাই ভেঙ্গে দিল ভূষণ, নিজে নিজে যেচে বরণ করা যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে রটিয়েও দিল মেয়েটার নামে মনগড়া কলঙ্ক। ঘটনা রটনা গালাগালি হাতাহাতি পুরানো হয়ে তলিয়ে গেল অতীতে, জিদ বজায় রইল মুখ-দেখাদেখি বন্ধ রাখার, শত্রুতা করার। বিয়াল্লিশ সালে ব্যাপার হল একটা। বন্দুক উঁচিয়ে সৈন্য পুলিশ এসে অন্য ক'টা ঘর-বাড়ীর সাথে পুড়িয়ে দিল রাজেনের ঘরটা, আর এমনি মজার যোগাযোগ অদেষ্টের যে দু'কোশ তফাতে কেঁদা গাঁয়ে ভূষণের মামা জগন্নাথের বাড়ীতে সপরিবারে আশ্রয় নিয়ে দু'টো রাত কাটাতে হল রাজেনকে সপরিবার ভূষণের সাথেই। ভূষণ ভেবেছিল, মামাকে বলে ভূষণ তাদের খেদিয়েই দেবে বেহদ্দ মার-ধোর খুন-জখম বলাৎকার ঘর-পোড়ানোর তাণ্ডবের মধ্যে। তা' শোধ নেবার কথাটা ভূষণও ভেবেছিল একবার, এত কালের শত্রুকে জব্দ করার সুযোগ আর আসবে না জীবনে! কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দু'একটা কথা বলতে হয়েছে তাদের পরস্পরের সাথে। অবস্থা এমনি ছিল। সেই থেকে বিদ্বেষ ঘুচে গেছে তাদের, পথে-ঘাটে দেখা হলে দু'টো-একটা কথা তারা কয়ে এসেছে পরস্পরে, কিন্তু শুধু ওই শত্রুতার অবসান ঘটা ছাড়া বেশী আর এগোয়নি তাদের সম্পর্ক। কেউ এতকাল পা দেয়নি কারো বাড়ী, ক্রিয়া-কর্মে আপদে-বিপদে কেউ ডাকেনি অন্যকে। এত কাল পরে রাজেন আজ নিজে থেকে এসেছে তার বাড়ী। ওকে দু'টান তামাক না টানতে দিতে পারলে কেমন লাগে মানুষের?

মাটির মাশুল

একবারটি ঝেড়েপুঁছে দেখে এসবে না কি রসিক? ভূষণ আবেদন জানায়।

—নেই তো জানি। বলছো যদি দেখে আসি।

তিনটে বিড়ি নিয়ে আসে রসিক। তারই একটা রাজেনকে দেয় ভূষণ, পিদিম থেকে ধরাতে গিয়ে নিবে যায় শিখাটুকু পিদিমের। ফের হাঙ্গামা করতে হয় পাথর ঠুকে সলুই জ্বলিযে আগুন সৃষ্টি করার। দু'-এক টান টেনে বিড়িটা রাজেন বাড়িযে দেয় তোরাব আলিকে।

আনমনা ছিল তোরাব। এনতাব তাকে ডেকে বলে, বিড়ি ধর মিয়া।

এ বড় আশ্চর্য্য কথা যে এতগুলি মানুষ তারা বসে আছে প্রায় চুপ-চাপ। কথার কামাই নেই বটে কিন্তু এক সাথে কথা বলছে না একজনের বেশী, কথার আওয়াজে মোটে সরগরম নয় চোদ্দ জন চাষীর আসর। কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া সাধারণ চলতি আলাপ এটা-ওটা নিযে, তাই মন দিয়ে শুনছে সকলে যে যখন মুখ খুলছে। বিশেষ কিছু একটা শুনবার জন্য যেন উগ্র প্রত্যাশা সকলের. কিন্তু বিশেষ কথাটা উঠছে না বলে আগ্রহ চেপে যেন অপেক্ষা করার অসীম ধৈর্য্যও আছে সকলেরই। সবার মনের কথা কে আগে তুলবে, কি ভাবে তুলবে তাও জানা নেই কারো। বেশী উৎসুক এনতার, কেবলি উস্‌খুস করছে আর বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে চুলকিয়ে চলেছে ঘন রুক্ষ দাড়ি-ঢাকা চিবুক।

—খাবা না তুমরা? এসে শুধিয়ে যায় ভূষণের পিসী দয়া।

—খা গা যা মোহন।

—খাবো পরে।

একটা লণ্ঠন চলে যায় সামনের পথ দিয়ে, ঝক্‌ঝকে নতুন লণ্ঠন, সযত্নে কাটা পলতের উজ্জ্বল তেজী শিখা। কনেষ্টবল শশী পথ দেখিয়ে

নিয়ে চলেছে দারোগা মৃণাল বাবুকে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্ত্ত কেঁউ কেঁউ চীৎকারে বাতাস চিরতে চিরতে পথ ছেড়ে ছুটে পালায় রাসিকের বাড়ীর কুকুরটা। কে জানে দারোগা বাবুর চলার রাস্তায় পুঁটি কি খুঁজছিল বাড়ীতে চালার কোণে তার এক গণ্ডা বাচ্চা ফেলে রেখে।

বলি কি, রাজেন দাস বলে, উপায় একটা না হলি তো নয়। সব দিকে দেখি মরার যোগার।

অ্যাদ্দিনে জানলে সেটা! তিনু বলে খোঁচা দিয়ে।

আঃ হাঃ! বড়ই বিরক্ত হয় তোরাব, ছেঁদো কথা রাখো না এখন, ঘরে গিয়ে চাটনি খেয়ো।

—বলি কি, রাজেন দাস বলে, একটা উপায় চাই। এত নিরুপায় জম্মে হইনি কোন কালে। অজন্মা এল তো বুঝি, না তো এও বুঝি শালা একদম মন্বন্তর ঘটেছে, ও-সব যা করেন তা ভগবান করেন, তেনার নীলা-খেলা আর মোদের অদেষ্ট। কিন্তু ই কি রে বাবা, অজন্মা না, দুর্ভিক্ষ না, খাসা ফলন, তবু হাঁড়ি চড়বে না, ছেলে-পিলে খিদেয় কাঁদবে?

শুধু কাঁদে না কি? তিনু বলে, মরে না?

শ্রীনাথ বলে, বিন্দাবনের বড় ছেলেটা মরেছে, ছোটটা মরবে। ওই যে মণি বাবু, জ্ঞান বাবুর ভাগ্নে, তেনা ছুটে শুধোতে এল—

আঃ হাঃ! তোরাব বিরক্ত হয়ে বলে।

কিন্তু এবার তার বিরক্তি ও আপত্তি খণ্ডন করে রাজেন বলে, না না, শুনি ব্যাপার।

শ্রীনাথ বলে যায়, কলকাতায় কাগজে লিখবে কি না যে না খেয়ে মরেছে, তাই শুধোতে এল জ্ঞান বাবুর ভাগনে, মোদের ওই মণি বাবু। তা ইদিকে মিণাল বাবু শাসিয়ে গেছে, উপোসে মরছে তা বলতে পাবে না,

বলবে যদি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে, কয়েদ করবে। বিন্দাবন কি করে, মণি বাবুকে বলল, না বাবু, না খেয়ে মরেনি ছেলে, ব্যারামে মরেছে। তা, ব্যারামটা কি হয়েছিল? তা কি বুঝি বাবু চাষাভূষো মানুষ, ও কি জানি কি পেটের.ব্যারাম। তোমার ভয় নেই বিন্দাবন, যে যেথা আছে তোমার ছেলের মৃত্যুর শোধ নেবে। না, ব্যারামে মরেছে ছেলেটা বাবু। ব্যারামেই মরেছে।

গলা-খাঁকারি দিয়ে থুতু ফেলে শ্রীনাথ কথার শেষে।

রাখাল বলে আস্তে আস্তে, মণি বাবু এক পসারি চাল দেছে বিন্দাবনকে। আর দু'টো কমলা দেছে বিন্দাবনকে ছেলেটার তরে। বলল কি, মামা কত খায়, এট্টু এট্টু রস করে ছেলেটাকে দিও বিন্দাবন। মণি বাবু এমনি কমলা দিয়ে এমনি করে বলতে বিন্দাবন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। স্বীকার করলে না বাবু, ছেলেটা ব্যারামে মরেনি, না খেয়ে মরেছে। কলকাতার কাগজে বেরুবে খপর।

—বলি কি রাজেন বলে খানিকক্ষণ নিজে আর অন্য সকলে চুপ করে থাকার পর, কি করা যায়। আর তো সয় না। মোদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না কি শালার ব্যাটা শালা ধরণী শালা? ই কি রে বাবা, গাঁ পিতিবেশী চাইলে মানুষ ধান দেয় যে হাঁ আজ বাদে কাল ফিরিয়ে দেবে! মোরা তোর গাঁয়ের মানুষ, একটা মাসের তরে দু'টো ধান দিবি, কর্জ্জ দিবি, তাতেও তোর দেড়ভাগি চাই? বলি, মাগ যে তোর বছর-বিয়ানী, দু'-তিন মাস ছুঁতে পাস না ফি বছর, তা ভাত-কাপড় কি বন্ধ রাখিস মাগের? না, কুঞ্জা জেলেনীর পিছে যা খরচ করিস তার সুদ কষিস্?

খিল খিল করে হেসে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে থমকে থেমে যায় অল্পবয়সী যোয়ান মোহন। ভূষণ মুখ ভার করে তাকায়। যেন পিদিমের মৃদু

আলোয় ভাইটা তার মুখের ভাব দেখতে পাবে। অন্তেরা বিরক্ত হয় না, তবে বুঝেও উঠতে পারে না এমন কি রসিকতা আছে। গুরুতর কথাগুলির মধ্যে রাজেনের যে হাসি সামলাতে পারল না মোহন। রাজেন স্পষ্ট করে জমাট করে প্রকাশ করেছে সবার মনের এলোমেলো অশান্ত খেদ। এ তো সত্যি কথাই যে ধরণী যেন রাজা-বাদশা, ঘরের বৌ পরের মেয়েছেলেকে খুসীমত ভোগ করবে, টাকা নাড়াচাড়া করবে যেন পয়সা হাতের ময়লা মাত্র, নতুন ফসল ওঠার আগেও ধান ভরা থাকবে পাঁচটা খামারের দু'টোতে আর হেথা-হোথা ছড়ানো—এদিকে নিজের নিজের একটি পরিবাটিকে তারা যে ছোঁবে সে সামর্থ কই, ছোয়াছুয়ি সইবার শক্তি কই সে বেচারার, গর্ভবতী বৌগুলির কথা তো আলাদাই, তারা বাঁচে কি না বাঁচে নিত্য এ ভয় ভরা মাস হবার আগেই। টাকা আর ধান শুধু তাদের ঋণের খত। জমি যার আছে দু'বিঘে তারও, এক মুঠো মাটিতে যার স্বত্ব নেই তারও। ঠিক কথাই তো বলেছে রাজেন!

—খাবা না? এসে শুধিয়ে যায় ভূষণের বিধবা পিসী দয়ার বিধবা মেয়ে হারাণি।

—দুত্তোর নিকুচি করেছে তোর খাওয়ার, রেগে তেড়ে-মেড়ে ওঠে ভূষণ, দিবি তো দুধ-পোয়া মাপে আলুনি ফ্যান-ভাত, ডাকের কামাই নেহ, লুচি-পোলাউ ভোজ খেতে ডাকছে যেন হারামজাদি।

ভোঁ করে কেঁদে ওঠে হারাণি কলের দড়ি-টানা বাঁশীর মত, যুবতী মেয়ের মনটা যেন চড় খেয়ে কেঁদে-ওঠা শিশুই আছে এখনো, আর নাক দিয়েও তার সিকনি নামে সেই ছেলেবেলার মত, নাক টেনে টেনেও সামলাতে পারে না। মরণ ঠেকাবার উপায় খোঁজার জন্ম জড়ো এই চাষীর আসরে যেন ছেঁড়া তালি কাপাসে আধ-টাকা রোগা রুগ্না

মূর্তিমতী বিঘ্ন। পুরাণে নজির আছে, পিনাক সামন্ত, ভাবে খুসী হয়ে, অর্জ্জুনের তপস্যা ভাঙতে এমনি ভাবে এয়েছিল উর্ব্বশী—মেয়েগুলো মরে না, এই যুবতী মেয়েগুলো?

—আমি ডেকেছি? মা বলল না ডাকতে? নিজে যদি এসে ডেকে থাকি তো—নাকের জল চোখের জল খেতে খেতে কথা বলতে গিয়ে বিষম লাগে হারাণির। আচমকা অন্দরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঠাস করে গালে তার একটা চড় বসিয়ে দয়া তাকে ভেতরে টেনে নিয়ে যায়।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে ভূষণ বলে, সহরে ছিল বছর দেড়েক দু'য়েক। দুভিক্ষের ফলে পুষতে পারিনি, মোর যে দাদা দুকান করে সাহস, তার ঠেঁযে পাঠিয়েছিনু মরতে। এমনি দশা হয়ে ফেরত এয়েছে মেয়ে। কি নাকি ব্যারাম হয়েছিল—সহুরে ব্যারাম।

—কি দুকান করে হে নয়ন সহরে? এক জন শুধায়।

চুপ করে থাকে ভূষণ।

—শুনি তো কত কাল নয়ন না কি দুকান করে, তা দুকানটা কিসের?

—কি জানি কিসের দুকান। এবার রেগে বলে ভূষণ।

—আঃ হাঃ, তোরাব বলে জোর দিয়ে, দুকানের কথা যাক। ধরণীর দু'টো খামারের ধানের কথা বলাবলি, উয়ার মদ্যি দুকান! কি দুকান, কিসের দুকান। কাজের কথা কও। সাতনলার খামারে লোকজন বেশী রয় না।

শুনে সবাই আবার ধাতস্থ হয়ে গুম্ খায়। ধরণীর একটা খামার আছে সাতনালায়। ধান বোঝাই খামার। তা সে খামার তো আগেও ছিল, এখনো আছে, কি তাতে। সবাই জানে আজ এই মরিয়া

বেপরোয়া মানুষগুলির আসরে ধরণীর ওই ধান-বোঝাই খামারের কথা ওঠার মানে কি, খামারে লোকজন বেশী থাকে না এ কথা বলারও মানে কি। তবে কি না, যার যার মনে মনে বোঝা কথাও সবার মিলেমিশে এক সাথে এক ভাবে বোঝা তো দরকার।

—তা বটে, রাজেন বলে, উযার খামার-ভরা ধান, মোদের দুর্দ্দশা।

—ধানে উয়ার স্বত্ব কি ?

—লুঠের ধান না ?

—আসলে মোদেরি ধান তো, না কি বল ?

—গাযেব জোরে কেড়ে নেছে বই ত না ?

এ তো একই কথা, ঘুরিযে বলা। এত দূর এগিযেও পরের কথাটা জিবের ডগায় এসে আটকে আছে অনেকেব। ধীর, অতি ধীর জীবন এদের—অকালে বুড়িযে ঝরে যায, তবু ধীর। ঘুম ভাঙ্গে হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙ্গে, সন্দ করে যে সত্যি রাত শেষ না চাঁদের আলোর আভা বাইরে—না, ভোরই হচ্ছে, কাকের ডাক শোনা যায। মাঠে গিযে লাঙলের ফলা মাটিতে ডারায়, ফসলের আশা তার কাল নয, পরশু নয, মাসকাবারে নয়, সেই ফসল ফলাবার পর। ধৈর্য্য ছাড়া তার কি চলে, ধীর না হযে উপায আছে ?

শেষে মোহন বলে, ধান যদি মোদের, কেড়ে নিতে, লুঠে নিতে পারি না মোরা ? না, ওটা ধরণীদের একচেটে কারবার ?

—বলি কি, রাজেন তখন বলে, কথাটা বিবেচনা করি এসো মোরা। লুটে আনতে চাও যদি তো চল যাই আজ রাতেই হানা দি সাতনালার খামারে। তবে কি না হাঙ্গামা হবে তা বলে রাখি, বিষম হাঙ্গামা হবে। তখন দুষো না মোকে।

সেই যেন এতক্ষণ ধরণীর সাতনালার ধানের খামার লুঠ করার

প্ররোচনা দিচ্ছিল সকলকে. পরামর্শটা গ্রাহ্য হওয়ায় সাফাই গেয়ে রাখছে হুঁসিয়ারির। ঘরে কাটা চরকার স্বতোয় মদন তাঁতিকে দিয়ে বোনানো খদ্দরের কাপড় আর কামিজ গায়ে সতের দিন হাজত খেটেছিল রাজেন। বিয়াল্লিশে ঘোষণা করেছিল, গান্ধীজী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাকে আদেশ দিয়েছেন যে, স্বরাজ এসে গিয়েছে। আর ভয় নেই।

এনতার খুসী হয়ে বলে, হাঙ্গামার কমতি কোথা? হাঙ্গামা ছাড়া ক'দিন কাটে? ঘর তো করি হাঙ্গামা নিয়ে। রামপুরে মোর চাচা থাকে এ গোস্তাকির মাপ নেই, পরশু রোজ তাই হানা দেয়নি মোর ঘরে? হাঙ্গামার কথা বলো না দাদা, ওটা খোদার নজরানা।

—কি আর হবে হাঙ্গামায়?

--কচু করবে মোদের, যা করার করেছে।

—মারবে তো? মারুক। মরেই আছি।

—হাঃ, মরে আছি। কেন বাবা মরে রইবো? খালি খালি মরে রইবো? মারতে জানি না তুষা দিয়ে।

—বলি কি, রাজেন বড় গম্ভীর, গলার আওয়াজ গমগমে, চলো তবে আজ রাতেই যাই। কথা তবে শুনে রাখো কিন্তু, লুঠবো গিয়ে এক সাথে, তার পর যা ঘটবে সবই মোরা একসাথে তার দায়িক। ধান নিয়ে চটপট সরে পড়বে। ঘরে রাখবে না ধান।

—কোথা রাখব? এক জন শুধায়।

তাও জানো না? রাজেন বলে হতাশায় অবজ্ঞায়, ধান ফেলে রাখবে বন-বাদাড়ে, ডোবার ধারে। খানিক বরবাদ যাবেই, উপায় কি!

বক্তা

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায আকাশে। জোরালো শব্দ তুলে ঠিক যেন তেড়ে মেড়ে এসেছিল এক পশলা বিষ্টি, দেখতে দেখতে ফুরিযে গেল। আকাশ জুড়ে শুধু আছে গর্জ্জন আর আলোর চমক।

ঘুঁটেগুলি ঘরে তুলতে সাহাষ্য করেনি তাই কাসা গর্জ্জে গর্জ্জে গাল দিযে যায একটানা আকাশে জলহীন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাসা ভাসা মেঘের গজরানির মত। একটানা অফুরন্ত। দোংড়া হাসি মুখে দাদ চুলকায বসে। কথা বলাই তাব নেশা আর পেশা। কিন্তু বৌ গজবাতে সুরু করলে সে চুপ মেবে যায, তার এই বস্তির পৃথিবী যেন তাকে বাজা করেছে সে বোবা বলে। শুধু দাদ চুলকোয। দু'হাতের আঙ্গুলগুলি দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হয পিঠ থেকে পেটে পেট থেকে উরুতে উরু থেকে পাযেয গোছায পাছায ঘাড়ে, পাযের আঙ্গুলের চিপায। পাযের আঙ্গুলের চিপায দাদ নেই, অন্য চুলকানি।

সুব্বা বোতল নিযে এলে সে এতক্ষণ পরে ঝকঝকে দাঁতগুলি বার করে ঠোঁট ফাঁক কবা একরাশি খুসীব হাসিতে। বোতলটা আযত্ত করে বেড়া ঘেঁষে শুইযে রেখে কাঁচা বদগন্ধী চামডাটা চাপা দিযে আড়াল করে বলে, শালীকে চুপ করা দিকি, মরদ বুঝব।

মারব টেযে এক—? সুব্বা শুধায নেশার ঝোঁকে। আজ তার ভীষণ পরীক্ষাব বাত্রি। বোতল এনেছে, ভোগও এনেছে, তবু টেনে এসেছে নিজে নিজে।

গেঁড়িকে চিরকালেব জন্য বশ করার কাযদা-কানুন দাওয়াই সালাই

বাতলে দেবে দোংড়া, বাঘিনীর সঙ্গে সাত বছর বসবাস ঘর সংসার করেছিল যে সিংজতকা তার একটু করে হাড়ও তাকে দেবে।

—মা'রলে হাঙ্গামা হবে।

—বেশ তো। আচ্ছা তো ঠিক করে দিব।

কাঁচা বয়সের যোয়ান, গোঁ কত। হাসি আসে দোংড়ার পিছু পিছু গিয়ে সে বেড়ার ফাঁকে চোখকান পেতে ত্যাখে শোনে কাসাকে ঠাণ্ডা করার তার ছেলেমানুষী কায়দা 'কতটা সফল হয়। গোড়ায় তেজ কত সুব্বার জোর কত!

—অত গোসা কেনে গো মাসী!

—মরনা কেনে? মর গা যা।

—রয়ে সয়ে মাসী, যা বলতে আলাম শোন আগে, তারপর নয় কেমড়ে দিও। তবে কিনা হাঁ, গোসা করলে খাসা দেখায় বটে তুমায় মাসী, মন করে কি তুমায় বাগিয়ে নিয়ে বনে পালাই।

—হাঁ বটে? তা বনে পালিয়ে কাজ কি! নেনা মোকে, এখনি নেনা বাগিয়ে।

মস্ত যোয়ান চেহারা কাসার, দু'হাতে সাপটে নিয়ে সে পিষে চেপে ধরে সুব্বাকে, হাঁসফাস করে উঠে সুব্বারও প্রাণ পাঁজরা দুইই।

—মাল টেনেছে ছোঁড়া! কাসা বলে মুখ বাঁকিয়ে। রাগত মাসীর বাড়তি-জোর কিন্তু যেন খানিকটা ঢিল হয়ে আসে তার হাতে, বুকে পিষে চ্যাপটা করে দেবার মত জোরে সে আর চেপে ধরে রাখে না কাঁচায় পাকা রোগা ছোঁড়াটাকে।

—মোকে কি বলবি যে?

—মাল এনেছি। একটো মুরগী!

হাত দুটো গলায় জড়াতে গেলে কাসা একটু অবাক হয়ে মুচকে হেসে ঠেলে তাকে সরিয়ে দেয় তিন হাত পিছনে।

—গেঁড়িকে বাগাতে মাল এনাছে মুর্গী এনাছে, মোর সাথে পিরীত করতে চায়। যা, মরগা যা গেঁড়ির কাছে।

বলে সে খল খল করে হাসে।

দোংড়া গা চুলকায় আর হাসে, বলে, দেখলি ?

—কেনে, চুপ মারাই নি উযাকে ?

—তা নয়। গায় জোর দেখলি হাত্তির মত ? বিড়ি ধরাণো বন্ধ রেখে খ্যা খ্যা করে দোংড়া হাসে শেযালের আওয়াজে।

সুব্বা তাকায় সন্দিগ্ধ চোখে, তার ভয় হয়, অবাক লাগে।

—তু জানলি কিবা ?

—চোখ মুদে দেখলাম। দোংড়া বলে অবজ্ঞার সুরে। চোখ মুদে ভুঁয়ে এমনি লাগাবো আঙুল, গায়ের গন্ধ যার জানি সে যেথা থাক ভুঁযে দৌড়িয়ে, নজরে এসবে। আর জলে যদি রয় তো জল ছোঁব চোখ মুদে, সমুদ্দুরে ডুবে থাক নজরে এসবে।

চোখ পিট পিট করে দোংড়ার যেন দ্রুত মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে যাচ্ছে চোখের পাতা নেড়ে।—সাপে কাটল গুরুকে। আগে হুকুম দিল গুরু, নয় তো তাকে কাটবে এমন সাপ কুথা আছে জগতে ? বাঁচা দোংড়া, কালসাপে কেটেছে, গুরু বললে মোকে। মোকে যাচাই করবে আর কি, না তো দশ বিশটা কালসাপে কাটলে কি হবে তার, বিষ বেরিয়ে যাবে ঘামে। কালসাপ কাটলে যেমন যেমনটি করণ আর যেমন যেমনটি না করণ সব করলাম আর না করলাম ঠিক ঠিক, একটুকু

খুঁত হল নাই, ভুলচুক। গুরু বললে মোকে বাঁচালি দোংড়া, বড় বিদ্যা দিব তোকে। এই বিদ্যাটা শিখাই দিলে। মাটিতে আঙুল ছুঁয়ে দূরের মানুষ নজরে আনা।

বিড়িটা ধরিয়ে উদাসভাবে দোংড়া টান দেয়, ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ে।

—যা যা বলেছিলাম ঠিক ঠিক কর‍্যাছিস ?

—হাঁ। ভুলচুক নাই।

—গেঁড়ির চুল এনাছিস তিনগাছ, মাড়ানো মাটি ? ষাঁড়ের লোম ? আর সেই সেটা ?

দোংড়া শুধিয়ে যায়, সায় দিয়ে যায় সুব্বা।

—সেটা দিলে কে ?

—গাবার বৌ। গিয়ে চাইতে না এই মারে তো সেই মারে, ওস্তাদের সাপ লাগবে ভয় দেখাতে রাজী হল।

—গাবার বৌ। চিন্তিত মুখে বলে দোংড়া, গাবার বৌ ? ছেলা হইছে একটা। আর কারুকে পেলি না, ছেলা পিলা হয় নি ?

—অাঁ ? সুব্বা আঁতকে ওঠে, সামান্য ভুলের জন্য এত হাঙ্গামা এত পয়সা খরচ সব ভেস্তে যাবে !—তু কেনে বললি না উ কথা ?

দোংড়া ভরসা দিয়ে বলে, ঠিক আছে। হবে'খন যা। একটুখানি কমজোরী হতে পারে তুকটা, তা কাজ চল্যা যাবে উয়াতে। পরের ঘরের মেয়া বৌ হলে ভাবনা ছিল। নিজের বৌ তো, ঢের হবে উয়াতে, ঢের। পা চাটবে বশ হয়ে।

কাসা ইদিক-সিদিক কথা কয় না, সোজা দাবী জানায়, বোতল কই ? বোতল দে।

—গুজাই হয় নি যে ? দোংড়া বলে ভয়ে ভয়ে।

মাটির মাশুল

—শুদ্ধাই কর? আটক কিসের শুনি তা? মতলব জানি তুমাদের। ইদিকে ঘুমাব, দিন ভোর খেটেছি ঘরে বাইরে. ভেঁাস ভেঁাস ঘুমাব, বোতলটি খুলে তুমরা সাবাড় করবে ছ'জনায। কর শুদ্ধাই, মোর সামনে কর।

সুব্বাও জানে কাসার ঘুমোবার অপেক্ষায় আছে দোংড়া। বাইরে খেটে পয়সা কামায কাসা পেটের জন্য, দোংড়া যা ভরণ পোষণ যোগায় তাতে তার পেট ভরে না। এত খাটে কাসা যে রাত জাগতে পারে না, মড়ার মত ঘুমোয় রাত বেশী বাড়বার আগেই বিছানা নিযে। কাসা ঘুমানো পর্য্যন্ত দেরী না করে সুবিধা নেই। তার জাগন্তে বোতল খুললে একা সে আদ্ধেকটা গিলবে।

—প্যাঁচার ডাক না শোনা তক—

শুনেছি ডাক। ওদিকে ডেকেছে, জামগাছটায। শুদ্ধাই কর, এসতেছি।

শুদ্ধাই-এর প্রক্রিযা সুরু করতে করতে দোংড়া খ্যা খ্যা করে হাসে। বলে, দেখছি? ও মাগী মোষের মত গুঁতোয! হাড় পাঁজরা ভাঙ্গে নাই তো তুর ছ'টো একটা?

কুথা এত জোর পায ভাবি।

খায যে, গা চুলকে চুলকে বলে দোংড়া বলার মত কথা পেয়ে মোর চেযে ছ'গুণা তিনগুণা খায়, ভালা ভালা জিনিষ আনে. একলাটি খায। খাও তো সব না খাও তো কিছু নাই। গুরু গুণ দেছে তাই, না তো উযাকে বশে রাখতে পারতাম মুই? যদি না গুণিন হতাম, মানুষ হতাম তোর মত? হঁা হঁা বাবারাম, গুণিন না হলে মোকে চুষে লিত দশ দিনে, ছাবড়িয়ে দিত, মেরে দিত একদম। গুণিন যাদে খাওযা সব, উ ছাড়া কিছু নাই।

মাটির মাশুল

হাতের দশটা আঙ্গুল সারা গায়ে চুলবুল চুলকে বেড়ায়। বক্তৃতা যত জোরালো হয়, তার চুলকানি তত বাড়ে।

পেট ভরে মাছ দুধ খেলে তোর তেজ কত, মুৎজুয়ানি কত, কাজে তেজ, বজ্জাতিতে তেজ। দুটো দিন উপোষ দে, ভালা কাজে ঝিম্‌ঝিমোবি, বদ কাজে ঝিম্‌ঝিমোবি, কুথাও গা নাই, সাড় নাই। শালা বোকা বুঝিস না সিধা কথা? দুটা দিন উপাস করে বলিস দিকি গেঁড়িকে একবারটি কাছে এসো—গেঁড়ি এসবে, হেঁসে হেঁসে টিটকিরি দেবে রাত ভোর! হাসবার চেষ্টা করতে গিযে এবার অদ্ভুত একটা আওযাজ বার হয় দোংড়ার মুখ থেকে। শুদ্ধাই-এর প্রক্রিয়া চটপট সারবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সবটা না করলেও অবশ্য চলে। সুব্বা টেরও পাবে না কি প্রক্রিয়া বাদ পড়ল কিন্তু দোংড়া নিজেই যে পারে না যা এসেছে করে বরাবর, করতে করতে পুরুত ঠাকুরদের পূজো আচার মত যা তাব অভ্যাসে আর স্বভাবে দাঁড়িযে গেছে তা কেটে ছেঁটে ছোট করতে! তাতে দোষ হবে। রাগ করবে আঁধারের জীবরা। সুব্বার মত যারা আসে তাব কাছে তাদের মনে খটকা লাগবে তার অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে।

কথা সে বলে যায সমানে।—গুণিন বাদে আর সবার খাওয়াই সব। আরে শালা, কেষ্ট ঠাকুর যে দশবিশ হাজার গয়লা মেয়েকে মজুত রাখত রাধা শুদ্ধু, সে শুধু ক্ষীর ননী সর খেতো বলে, ঘরে খেত ফের পরের ঘরে চুরি করে খেতো, তবে না! খেতে যদি পেতিস জুত করে তো কি এসতিস মোর কাছে এ তুকের জন্তে, এমনিতে গেঁড়ি তোর বশ থাকত, পা চাটত দু বেলা!

ক্রিয়া কর্ম্ম শেষ হবার আগেই কাসা এসে পড়ে চুপচাপ একপাশে বসে থাকে, কথা কয় না, বাধা দেয় না। সময় মত জ্বলন্ত অঙ্গারটাও

সে দোংড়াকে বুগিয়ে দেয় বরাবর যেমন কৌশলে দিয়েছে তেমনি ভাবে।

সিংহীকে বশ করে যে মহাপুরুষ অনেক বছর সিংহীর সঙ্গে বসবাস করেছিল তার হাড়ের টুকরোটি হাত পেতে নিতেই জলে পুড়ে যায় হাতের তালু সুব্বার!

ফেলে দিলি! ফেলে দিলি! আর্ত্তনাদ করে ওঠে দোংড়া।

বিড় বিড় করে বলে, তেজ ফারাক হযে গেল, ভাগ হযে গেল। শালা তু কেমন মন্দ? থাম্, বোস চোখ বুঁজে। কুড়িয়ে আনি, তেজ খানিক দি তোকে।

হাড়ের টুকরোটি কুড়িযে এনে সে সুব্বার হাতে দেয়। জলন্ত অঙ্গারটি পিযে গুঁড়ো হযে নিভে গিযে মিশে গেছে উটোনের মাটির সঙ্গে।

হল না কি? কাসা শুধোয়।

হাঁ। সব ঠিক আছে। এ শালা মাটি করলে সব। শালা হাতে পেয়ে—

বক্‌বক্! বক্‌বক্! সিহীর মত গর্জে উঠে কাসা, চুপ যা। সিলাই কর ঠোঁট। আর যদি কথা বলবি তো তোর মুখটা মোর চট সিলায়ের ছুঁচ দিয়ে মিলিয়ে দিব। খোল বোতল!

এক আধ বোতল নিজের গলায় ঢালে না কাসা, মাল সে নেয় খুব কম। আশ্চর্য হয়ে সুব্বা ছাখে কি, দোংড়াকেই সে খাওয়াচ্ছে বেশী বেশী করে। তাকে পর্য্যন্ত কম দিচ্ছে। একবার সে প্রতিবাদ জানাতে যায়। কাসা হাত বাড়িযে গালটা তার টিপে দেয় জোরে। ব্যথায় কাতরে উঠেই নেশায় সামলে নিয়ে সে চোখ ঠারে কাসাকে।

এ ন্যাকামিতে গোসা করে কাসা বলে, মর না কেনে? যা মরগা যা।

মাটির মাশুল

তখনো আলোর চমকে চমকে আওয়াজে গর্জে গর্জে বিদ্যুৎ খেলছে আকাশে।

—দেবরাজ ইন্দর ব্যাটা, দোংড়া বলে যায় জড়িয়ে জড়িয়ে, এমনি কাণ্ড করে অখন তখন খেয়াল হলি পর, মানুষটা খেয়ালি ভারি, উঁহুঁ, মানুষ না মানুষ না, দেব্‌তা দেব্‌রাজ, কথাটা কি যে তেনা মানুষের মত খেয়ালি, হাওয়া গাড়ির রেতের বাবু। তাই কয়ে কি, দু'ফোঁটা বিষ্টি দিযে বলে, বাস্‌। বজ্জর নিযে লুটোপুটি খেলা করে আকাশে। বেম্মার বারণ আছে, হাত ফসকে বজ্‌জর যদি ভূঁয়ে পড়ে তো পেলয়ের আগেই দফা শেষ পিথিমীর। তা মানা কি মানে সে না মানতে পারে, রাজা, সে দেবতার রাজা, মানা করলে খেপে বলে কি যে দুত্তেরি তোর মানার নিকুচি করেছে, চালাও হাওযা গাড়ী চালাও, জোরসে! ওর স্বভাব এমনি তো কি করবে ও বেচারা! চিরকালডা এমনি ও শালা, যুয়ান বয়স থেকে। শিখতে গেছে ওস্তাদের কাছে, সে মস্ত ওস্তাদ, গোতম ওস্তাদের নাম নিযে চান করলে রাজার রাণীর গভভো হত। ধম্মো মানা করলে, গোতমের বৌটা বড় ইয়ে মত, তড়বড়াতে যাস নি ইন্দর তার সাথে। দরকার কি ছিল বাপু তোর গাযে পড়ে মানা করার? তুই ধম্মো, তুই কি জানিস না ইন্দর মানা মানে না, যা মানা ঠিক তাই করে, না তো সে রাজা কিসের, দেবতার রাজা? গোতমের বৌটা তড়বড়ায়, নামটা কি যেন ছিল তার, আউলা সতী? হাঁ, আউলা সতী। তা, আউলা সতী তড়বড়াক, ধম্মো মানা যদি না করতো তো ইন্দর শুধু শিষটিষ দিতো, চোখ চেয়ে বলতো হুস্নরে, জয় হিন্দ. এক পাত্তর সুধা টেনে আউলার চুলে এক থাবড়া বসিয়ে গোতম ওস্তাদের কাছে যেতো বিদ্যে শিখতে। বুড়ো যেতো রুগী, শুধু মানা করে করে ধম্মো বজায় রেখেছে চিরটাকাল, সবাইকে শুধু মানা করা তার

কাজ। সে কেন পারবে দেবরাজ ইন্দরকে মানা না করে? আউলা তড়বড়ায়, ইন্দর ভাবে, ধম্মো মানা করেছে। ভাবে, মানা করেছে? মোকে মানা করেছে? দুত্তেরি ধম্মো, দুত্তেরি মানা! আউলা তড়বড়ায়, সেও গিয়ে তড়বড়ায় তার সাথে। ওস্তাদি শেখে না কিছু। শিখলে কি এমন ফ্যাসাদে পড়ে দৈত্য মারা নিয়ে, অস্থি মুনির পা ধরে কেঁদে বজ্জর আনতে হয়? আউলার সাথে তড়বড়াতে তড়বড়াতে ইন্দর ছাথে কি, হায় সর্ব্বনাশ, গর্ম্মি হয়ে ঘা হয়েছে সারা গায়ে। ধম্মো কেন মানা করেছিল তা টের পেয়ে হাপুস চোখে কাঁদে ইন্দর। শুধু কাঁদে আর কাঁদে। এত কাঁদে যে তার চোখের জল বিষ্টি হয়ে পড়ে পিথিমীতে। বিষ্টি হতে চাষীরা জমি চষে চাষ সুরু করে দেয়, ভাবে ফসল যদি—কাসতে হওয়ায় একটু থামতে হয় দোংড়াকে।

খা না কেনে? কাসা তার মুখে তুলে ধরে মাল ভরা ভাঁড়টা।

আকাশে শুধু চমক আর গর্জ্জন। পূর্ণিমা কদিন পরে, চাঁদ গেছে আড়ালে তার পাত্তা নেই। দুরে ওই সড়ক বেয়ে চলেচে দুটো দুটো জ্বলজ্বলে চোক মেলে ধবধবে সাদা আলো ছড়িযে ছড়িয়ে চাকাওলা কলের গাড়ী।

—দেখছিস? দু'ফোঁটা বিষ্টি দিয়ে এমনি খেলা করে ইন্দর, ব্যাটা দেবতার রাজা। দেনা বেটাচ্ছেলে, জল দেনা আরও দু'ফোঁটা, মাঠে ধান হোক? লাখ গণ্ডা লোক যে শালা মরে গেল না খেয়ে? না! না!—বীভৎস আর্ত্তনাদ করে ওঠে দোংড়া! সুব্বা চমকে ওঠে কাসা আরও কাছে ঘেঁষে যায় দোংড়ার। সুব্বাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, ঠিক আছে। ইবারে ঘুমাবে।

কাসা আরেক ভাঁড় তুলে ধরে দোংড়ার মুখে। তৃষাতুরের জল খাওয়ার মত দোংড়া সেটা শুষে শুষে নেয়। কাসার কাঁধে একটা হাত

রেখে আবার বকতে সুরু করে। এবার সে কথা বলে আস্তে আস্তে জড়িয়ে জড়িয়ে, চোক বুজে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

—ইন্দরটা এমনি। পরাণ নিয়ে খেলার সখ। দেনা বাবা ছু'ফোঁটা জল, চাষ করি? না! না! এবার আর্ত্তনাদ ফোটে না দোংড়ার গলায়, সর্ব্বাঙ্গে ঝাঁকি দিযে আঁতকে উঠে সে মৃদু ফোঁসফোঁসানির মত বলে যায, না না, বিষ্টি চেও না ও যেয়ো রাজার ঠেঁয়ে। ছু'ফোঁটা বিষ্টি চাইলে ও লুচ্চা বন্যা দেবে। সব ভেসে যাবে। ঘর দোর খামার ভেসে যাবে। মাইরি বলছি কাসা—

কাসার বুকে মাথা রেখে গুটানো পা ছুটো এবার সামনে মেলে দিযে দোংড়া একটা মস্ত হাই তোলে, চোয়াল ভাঙ্গা হাই। সে ঘুমিয়ে গেছে। ঘুমিযে পড়ার আগে পর্য্যন্ত সে কথা কয়, অনর্গল কথা কয়। ঘুমোলে এমনি একটা হাই তোলে।

কাসা হেসে বলে, রাত ভোর ঘুমাবে। বজ্জর পড়লে জাগবে নাই। আয়।

ঘর ও ঘরামি

সারারাত বৃষ্টি পড়িয়াছে, কখনো টিপি টিপি, কখনো ঝম ঝম। ভোরে দেখা গেল আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। অন্যদিন রোদ উঠিলে পৃথিবীকে কেমন দেখায় আজ যেন মনে পড়িতে চায় না; আজ চারিদিকে হাসির ছড়াছড়ি। সমতল মাটির উপর যা-কিছু মাথা উঁচু করিয়া আছে, ঝোপ-ঝাড় আর বড় বড় গাছ, লাউ কুমড়ার মাচা আর শন ও খড়ের ঘর, সব কিছুর গায়ে ঝরি ঝরি অবস্থায় অসংখ্য জলবিন্দুতে

অস্থায়ী ঝিকিমিকি। একটি ফোঁটা ঝরিয়া গেলেই চুয়াইয়া চুয়াইয়া আরেকটি সেখানে ঝুলিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে টুপটাপ শব্দ, কেবল মাঝে মাঝে বাতাস সাড়া দিয়া গেলে ঘরের পিছনের প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটির নীচে ঝর ঝর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাইতেছে।

ঘরের মধ্যে এখন আর জল পড়ে না। রাত্রে পড়িয়াছিল, মাঝরাতে সুরু করিয়া ভোর হওয়ার আগে পর্য্যন্ত। বৃষ্টির দেবতার মুয়ে (মুখে ?) আগুন—এমন শত্রুতা তিনি ভামিনীর সঙ্গে করেন। বাতিতে তেল ছিল, দেশালাই-এ কাঠি ছিল না। অন্ধকারে আন্দাজে কি ঠাহর হয় ঘরের কোনখানে জল পড়িতেছে না, পিঠ পাতিয়া পরীক্ষা করিয়া কত কষ্টে শুকনো কোনাটি বাহির করিয়াছে। তারপর হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সেখানে জিনিষপত্র জড়ো করা। বঁটিতে পা একটু কাটিয়া গিয়াছে গলাটা কাটিল না কেন? একেবারে দু'ফাঁক! আজ হোক কাল হোক ও বঁটি দিয়া নিজের গলা. তো কাটিতে হইবেই, রাত্রে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া সে হাঙ্গামা না হয় চুকিয়া যাইত, হাড়ে বাতাস লাগিত ভামিনীর!

কামিনী বলিল, বালাই ষাট! অমন কথা কইতে নেই দিদি সক্কাল বেলা। তা ঘরটা ছেয়ে নিলে হোত।

কে ছাইবে?

ওমা, কি গো! নশ গাঁয়ের ঘর ছাইছে যে ঘরের মানুষ তোমার।

পরাশর তাড়াতাড়ি বলিল, ছাইবো, এবারে ছাইবো, পেথম বর্ষা নামল, কে জানে শালা ঘরের চালা জল ধরে না।

হ্যাঁ বটে? জানতে না তুমি? আর বাদলায় জল পড়েনি ঘরে?

তা পড়িয়াছিল, মোটে দুচার ফোঁটা জল পড়িয়াছিল। তাই পরাশর তেমন ব্যস্ত হয় নাই। যা দাম খড়ের! এবার নিশ্চয় ঘরের চাল

মেরামত করিবে, দুচার দিনের মধ্যে। কামিনীর স্বামী জগৎ হাসিতে আরম্ভ করিলে ভামিনীর অন্ধকারক্লিষ্ট মুখেও হাসি ফুটিয়া ওঠে। কামিনী মাথাটা একটু কাত করিয়া তার দিকে চাহিয়া থাকে। তার চোখে-মুখে প্রশ্রয় ও সহানুভূতি। বিশ্বনিন্দিত দুরন্ত অকেজো ছেলের দিকে চাহিয়া মা যেন ভাবিতেছে, তোর মত কে আছে সংসারে, যে তুই শুধু আমার আমার আমার ?

ভামিনী জগৎকে বলে, দেখছ ত ? শুনছ ত ?

জগৎ ভামিনীকে বলে, দাদা চিরডা কাল এই মত। আর তা যদি বল তো তোমার এ বুনটিও কম লয। মন খালি ফুরুৎ ফুরুৎ উড়ছে পাখীর লাখান। কাজ যদি করবে তো লকদম লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, নযতো কিসের সংসার, কিসের কি, হেথা যাচ্ছেন, হোথা যাচ্ছেন, বসে বসে গান গাচ্ছেন। ছেলেটা ভুঁযে পড়ে কেঁদে সারা, একবারটি কোলে নিতে কষ্ট।

জগৎ ধীরে ধীরে কথা বলে, তার আপশোষও যেন ধৈর্য্য দিয়া গড়া। কুটুমবাড়ী আবার মেরজাইটি গায়ে দিযাছে, তাতে তাকে দেখাইতেছে সংসারধর্ম্মের ব্যবস্থাপকের মত। জগতের কথা শুনিতে শুনিতে তীব্র ঈর্ষা আর ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ভামিনী বার বার কামিনীর দিকে তাকাইয়া থাকে। কচি কচি পায়ে তার স্তন ঠেলিয়া কামিনীর ছেলে তার কাঁধ ডিঙ্গাইয়া ওপাশে গিয়া পড়িবার চেষ্টা চালাইয়া যায়। দু'হাতে আঁকড়াইয়া সে তাকে সেইখানে ধরিয়া রাখে।

কাল রাত্রেই জগতের জন্ম মণ্ডা আনিয়া রাখা হইয়াছিল, ভামিনী তাকে পিতলের থালায় কেনা মণ্ডা আর ঘরের তৈরী নাড়ু ও মোয়া খাইতে দিল। তারপর জগৎ বিদায় হইয়া গেল। কাজের মানুষ সে, তার কাজ আছে। কাজ সারিয়া দুপুরে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিবে।

ভামিনী বলিল, 'শীগ্‌গীর এসো, চট করে। রসুই সারতে কতখন!'

পরাশর বলিল, 'বিড়ি আছে নাকি আর?'

আগেই জগৎ তাকে পর পর অনেক বিড়ি দিয়াছে, অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এবারও দিল। ভামিনীর মুখে যে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠিল তার তুলনা হয় না। বিড়িটা ধরাইয়া পরাশর সজোরে টান দিতে চড় চড় করিয়া অর্দ্ধেকটা পুড়িয়া গেল। তামাক বিড়ির ধোঁয়াতে তার সুন্দর গোঁপ জোড়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কামিনী বলিল 'বিড়ি খেতে পার বটে তুমি, হাঁ।'

ঘরে কাদা হয় নাই, মেঝেতে ভামিনী গোবর মাটির পুরু ও শক্ত আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে, জল বাহির হইবার ব্যবস্থাও ভাল। জিনিষপত্র বাহির করিয়া ভামিনী রোদে দিল। কাঁথা বালিশ চাপাইয়া দিল গোয়ালের নীচু চালটায়, এখানে ওখানে বাঁশ বাহির হইয়া পড়ায় বালিশ আটকানোর অসুবিধা নাই। সমস্ত বাড়ীটার ছন্নছাড়া শ্রীহীন ভাবের রূপকের মত দেখায় শূন্য গোয়ালটিকে, দেখিলে দুঃখ জাগে, একটা অনির্দ্দিষ্ট দুর্ব্বোধ্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে ইচ্ছা হয়।

'আমি ঘর গুছোই দিদি। ঘাটে যাবে বলছিলে, সেরে এসো গে, যাও।'

ভামিনী বাসন হাতে ঘাটে চলিযা গেল। লুকানো দুটি থালা, দুটি গেলাস আর তিনটি বাটি বাহির করিয়াছে, কুটুমের কাছে আজ কোন রকমে মান বাঁচিবে। কামিনীর অনেক বাসন আছে, জগৎ তার বাসন বাড়ায়, কমায় না। ঘাটের পথে কাদায় ভামিনীর পা ডুবিয়া যাইতে থাকে। কাদায় আরও অনেক পায়ের ছাপ আঁকা আছে। ঘাটের কাজ সারিয়া সকলে বোধ হয় ফিরিয়া গিয়াছে। ভামিনীর আজ বড় দেরী হইয়া গেল। ঘরের কাজে দেরী হইলে, সময় মত নিখুঁত ভাবে

ঘরের কাজ সারিতে না পারিলে ভামিনীর কষ্ট হয়, বাঁচিয়া থাকায় যেন ফাঁকি পড়িতেছে।

কামিনী বলিল, 'ছেলেকে ধরো, ঘর গুছোই।'

পরাশর বলিল 'আমার ছেলে নয়, কাঁদবে।'

পরিহাসে খুসী হইয়া কামিনী মুখের একটা ভঙ্গি করিল। ছেলেকে শোয়াইয়া দিয়া ঘরের কোণে জমা করা হাঁড়ি, ভাঁড়, টিনের কৌটা ইত্যাদি জিনিষগুলির মধ্যে একটি হাঁড়ি শিকায় তুলিয়া রাখিল। ঘর গুছানোর এই দায়িত্বটুকুই সে যেন চাহিয়া নিয়াছিল। দক্ষিণের ছোট জানালার কাছে গিয়া বাহিরে চাহিয়া ডাক দিল, 'দেখবে এসো।'

রোয়াক হইতে পরাশর সাড়া দিল, 'কি দেখব, অ্যাঁ?'

'এসেই খ্যাখো না বটে নিজে?'

পরাশর উঠিয়া গিয়া দেখিল বিলের ধারে মাছের আশায় কুড়ি বাইশ জন লোক জমিয়াছে। বিলে অনেক মাছ, আজ সুযোগ পাইয়া ছিপ হাতে, কেঁচো হাতে লোভী মানুষ তাদের আয়ত্ত করিতে আসিয়াছে। বিলের দক্ষিণ তীরে ঘেঁষা ঘেষি কতকগুলি ঘর, অনেক দিন আগে ওই ঘরগুলির চালা পরাশর ছাইয়া দিয়া আসিয়াছিল। জমি ও ঘর ধার দিয়া বাবুরা নূতন প্রজা বসাইয়াছিল, বাবুদের সঙ্গে চুক্তি করিয়া দল বাঁধিয়া পরাশর সাত দিনে সমস্ত ঘরের চালা বাঁধিয়া দিয়াছিল।

চুক্তির অর্দ্ধেক টাকা কি করিয়া যেন বাতিল হইয়া গিয়াছিল, দলের অন্য ঘরামিরা গাল দিয়াছিল পরাশরকে। ঘরের বাসিন্দারা আজও বোধ হয় বাবুদের ধার শুধিতেছে, এতকালের মধ্যে কারো চালায় এক আঁটি নূতন খড় ওঠে নাই। তবে নূতন খড় দিবার দরকারও হয় নাই নিশ্চয়। পরাশর যে ঘর বাঁধিয়া দেয় তাতে অত সহজে নূতন খড় দিতে হয় না।

'জানি। তোমায় সবাই ডাকে।'

এতটুকু জানালা দিয়া দুজনে বাহিরে তাকাইতে গেলে গায়ে গায়ে ঠেকিয়া যায়। একটু আমোদ, একটু উপেক্ষা আর একটু মমতার দৃষ্টিতে পরাশর কয়েক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার গালটা টিপিয়া দিয়া আবার বলিল, দুষ্টু মেয়ে।

তারপর রোয়াকে গিয়া ঘরের দুয়ারের সামনে সে বসিল। হাই তুলিয়া বলিল 'কতকাল তোর সাজা তামাক খাই নি। এক ছিলুম খাওয়া দিকি কামিনী ?'

জগতের কাছে দেশালাই এর কাঠি ধার করিয়া রাখা হইয়াছিল। তামাক সাজিয়া দিলে পরাশর আরাম করিয়া টানিতে আরম্ভ করিল, কামিনী খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার মুখের তীব্র বিস্ময়ের ভাব এখনো কাটিয়া যায় নাই। খসিয়া পড়া ঘোটাটি সে খোঁপায় লটকাইয়া দিয়াছে।

'কুমড়ো ডগা রাঁধিস কামিনী, ঝাল দিয়ে।'

মাচা ছাইয়া সতেজ কুমড়ো গাছটি এদিকে ওদিকে শুন্যে লিকলিকে ডগা বাড়াইয়া দিয়াছে। বৃষ্টি হয় নাই, জল সেঁচিয়া ভামিনী বোধ হয় বর্ষার চেয়ে বেশী জল যোগাইয়াছে গাছটিকে। বুড়ো গাছে তাই এমন সবুজ পাতা আর কচি কচি ডগা। এবার গাছটি কাটিয়া ফেলিয়া কামিনী পুঁই আর লাউ মাচায় তুলিয়া দিবে।

ভামিনী ঘাট হইতে আসিয়া হাট যাওয়ার তাগিদ দিল। বোন আর বোনের জামাইকে কুমড়ো ডগা খাওয়াইলে তো চলিবে না ?

'এক প'র বেলা হল, যাও এবার।'

'এই যাই। হাট বসুক! বাদলা গেছে কাল রাতে।'

গ্রামের নিত্যকার তুচ্ছ হাট, ভোর হইতে না হইতে বসে। পরাশরের যুক্তি শুনিয়া ভামিনী সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বেতের

বাক্স খুলিয়া টিনের একটি ছোট বার্লির কৌটা বাহির করিল। নাড়া চাড়ায় শব্দের অভাবে না খুলিবাই বুঝা গেল ভিতরে কিছুই নাই। দু'দিন আগে হঠাৎ পরাশর কিছু রোজগার করিযা আনিয়াছিল, আজের জন্ত তার একটা অংশ ভামিনী কৌটায় রাখিয়া দিয়াছিল। বাকীটা একরকম সঙ্গে সঙ্গেই সে দিন খরচ হইযা গিযাছে।.

বাহিরে গিযা ভামিনী কাঁদিযা ফেলিল।

পরাশর বলিল, 'মরণদশা মোর, কান্না কিসের শুনি? বলছি পয়সা আছে হাটের, উনি কাঁদতে লাগলেন।'

'দেখি পয়সা?'

বারান্দার এক প্রান্তে কিছু খড় জমা ছিল, পরাশর খড়ের গাদাটা দেখাইয়া দিল।—'নিতাই এসে নগদ কিনে নিযে যাবে।'

'খড় বেচে হাট যাবে! এ বেলা যদি নিতাই না আসে?'

পরাশর অবজ্ঞাভরে একটু হাসিল, 'আসবে না নিতাই? উয়ার বাপ আসবে। কাল বলে দিইছি পষ্ট করে, সকালে গিযে নগদ দিযে খড় লিযে আসবে, তবে কাল চালায উঠব তোমার। না এসে যাবে কোথা?'

'উ, তুমি ছাড়া ঘরামি নেই দেশে।'

পরাশর কথা বলিল না। টান হইযা গোঁপে হাত বুলাইযা একবার শুধু উল্টাইয়া দিল। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাকে যেন বলা হইযাছে, তুমিই সব নাও, স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন!'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই নিতাই আসিল। তার গাযে ফতুয়া, গলায় তুলসী মালা। মুখের গোঁপ দাড়ি কামাইয়া ফেলায কানে চুলের গোছা ঝোপের মত দেখায়। খড়ের দিকে চাহিয়া বলিল, 'সুবিধে মনে হচ্ছে না তো পরাশর।'

পরাশর বলিল, 'হাঁ বটে! অমন কথা বলোনি নিতাই দা।

মাস কাটেনি এই খড় কুঞ্জ খুড়োকে বেচেছিলে তুমি নিজে। বলেছিলে সব চাইতে সেরা। কাজ করিয়ে কুঞ্জ খুড়ো বললে পয়সা তো নেই এখন পরাশর! আমি খড় নিয়ে পাওনা শোধ করলাম।'

নিতাই বিষণ্ণভাবে বলিল, 'অনেক জমে গেছে, বেচাকেনা একদম নেই। তোর এ খড় নিয়ে কি করব ভাবছি।'

'আমায় বেচে দেবে দু'দিন বাদে। ঘর-কাল ভেসে গেছে নিতাইদা, চালায় খড় না চাপালে নয়।'

গাড়ীতে খড় চাপানো হয়, নিতাই ঘন ঘন পরাশরের দিকে তাকায়। পরাশরকে কাল অবশ্য অবশ্য কাজ আরম্ভ করিবার তাগিদ দিতেও মনে থাকে না। একটা বিড়ি বাহির করিয়া বলে, 'লে খা।'

পরাশর হাত জোড় করিয়া বলে, 'তামুকের পর বিড়ি রোচে না নিতাই দা!'

খড়ের দাম দিয়া নিতাই চলিয়া যায়।

পাঁচ দিনের মজুরীর বদলে খড় পাইযাছিল, খড়ের বদলে পাইয়াছে পয়সা। পরাশর যেন রাজা হইয়া গিয়াছে। গামছা কাঁধে ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।—'বলো এবার কি আনব হাট থে।' তোর জন্ম কি আনব কামিনী?'

এতক্ষণ পরে ভামিনীর মুখে আজ প্রথম হাসি ফুটিল।

'এখনো খুকী আছে নাকি কামিনী, এমন করে শুধোচ্ছ? মাছ এনো বেশী করে উয়ার জন্ত, ছুঁড়ি মাছ পেলে কিছু চায় না। যাবে আর আসবে, বুঝলে?'

সত্যই অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে। ঘরের চালায় রোদে পুড়িয়া পুড়িয়া রোদের ঝাঁঝে আর পরাশর তেমন টের পায় না, ভিজা পৃথিবী ধীরে ধীরে গরম হইয়া ভাপ্সা গরম উঠিতে থাকিলে

সে বড় অস্বস্তি বোধ করে। বাড়ীর সামনে আম বাগানের সোজা রাস্তায় জল জমিয়াছে। গাছের ছায়ায় ঝোপ-জঙ্গলের আগাছাগুলি এখনো শাখা ও পাতায় জল ধরিয়া রাখিয়াছে। বাগানের মধ্যে পরাশর খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে, ছপ ছপ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে কামিনী আসিয়া তার নাগাল ধরিল।

'আমার জন্যে এনো একটা জিনিষ।'

'কি জিনিষ?'

কি আনিতে বলিবে কামিনী বোধ হয় ঠিক করিয়া আসে নাই। তাই ছুটিয়া আসিয়া হাঁপ ধরিয়া যাওয়ার ছলে ক'বার সে হাঁপাইল, অকারণে একটু হাসিল।

'এই গিয়ে আলতা এনো একটা—তরল আলতা।'

দু'হাতে কামিনী হাঁটুর কাছের শাড়ী তুলিয়া ধরিয়া আছে, হাঁটুর অনেক নীচে গোড়ালী ডুবানো জল। একটা পা একটু উঁচু করিয়া সে পরাশরকে দেখাইল।—ননদ তাড়াতাড়ি পরিয়ে দিলে. বললে কুটুম বাড়ী যাবি বৌ আলতা পরে যা। জল-কাদায় ধুয়ে গেছে দ্যাখো। আলতা পরে না গেলে ননদ বলবে, কেমন ধারা বোন তোর বৌ, পায়ে দু'পোচ আলতা দিলে না?'

ঘরের জানালার কাছে পরাশর পিছনে ছিল, কামিনী তার মুখ দেখিতে পায় নাই। এখানে তার মুখের একটু আমোদ একটু উপেক্ষা আর একটু মমতাও চোখে পড়িতে কোন বাধা ছিল না। দেখিয়া কামিনী ঝিমাইয়া গেল, থামিতে পারিল না। আগে, এখন এবং পরে যার এক সঙ্গে গতি মাঝখানে তাকে রোধ করবার ক্ষমতা আছে কার? মানুষ তার জগৎকে শুধু একবার শূন্যে ছুড়িয়া দিতে পারে: অসহায় বেদনা আর আক্রোশের মর্মে এই সত্যটাই তার গেঁয়ো মনের

গেঁয়ো ধরণে অনুভব করিতে কামিনী বলিল, 'শীগ্‌গির এসো হাট থেকে, এঁ্যা? তোমাদের সাথে বোসপুকুরে নাইতে যাবো। দিদি জানলে মানা করবে—দিদিকে লুকিয়ে যাব। রসুই ঘরে দিদি রসুই করবে, ঘাটে নাইতে গেলাম দিদি—ব'লে বোসপুকুরে চলে যাব। তুমি আগে গিয়ে বসে থাকবে আমার জন্যে। একলা যেতে ডর লাগে, জনমনিষ্যি নেই চারিদিকে।'

আরও বলিল কামিনী: 'দুপুরে আমায় হেথা-হোথা নিয়ে যেও।' পরাশর বলিল, 'কোথা যাবি দুপুরে?'

'যেথা যেথা নিয়ে যেতে আগে সেইখানে?'

হাটে গিয়া আগে পরাশর মাছ কিনিল। এত এত সওদা কিনিতে লাগিল যেন ঘরে তার মোটে দু'জন অতিথি আসে নাই। তরল আলতার কথা মনে পড়িলে দেখা গেল পয়সা শেষ হইয়া গিয়াছে। ছোট মণিহারি দোকানটির মালিক ভূধর বলিল, 'কেন বল্‌ছ? ধার তোমায় আমি দিতে পারব না। নেবার বেলায় নিতে জান, দেবার বেলায় আজ নয় কাল। তোমায় জানা আছে।'

তখন সেইখানে আবির্ভাব ঘটিল বাবুদের গোমস্তা নগেনের। গোমস্তাগিরিতে প্রাচীন হইয়াছে, এখন আর রাগিলেও রাগ করে না এবং রাগ না করিয়াও রাগ দেখাইতে জানে।

'ভোর থেকে দু'বার তোকে না ডাকতে গেল পরাশর? কাছারি ঘরে জল পড়েছে, মেজোবাবু আগুন হয়ে আছেন, তোর মতলবটা শুনি?'

'ঘরে আমার কুটুম এসেছে।'

'তোর ঘরে কুটুম এসেছে, মেজোবাবু এদিকে আমায় বড় কুটুম বলে খাতির করছে। ওসব কথা রাখ।' নগেন একটু থামে, ইতস্ততঃ করে।—'নগদ পাবি।'

মাটির মাশুল

কাজের শেষে নগদ নয় শুধু, এক শিশি তরল আলতার দামটা পরাশরের আগাম চাই। শুনিয়া নগেন কৌতুক বোধ করে।

'আজও তোর বৌ তরল আলতার বায়না ধরে! দাও ভূধর, এক শিশি তরল আলতা দাও ওকে।'

পাগলা দীনুকে দিয়া পরাশর হাট আর আলতার শিশি ঘরে পাঠাইয়া দিল। বাবুদের কাছারি ঘরের চালায় সে এদিকে কাজ করিতে লাগিল, ওদিকে অন্ন ব্যঞ্জন রান্না করিয়া ঘরের ছায়ায় জগৎকে ভামিনী খাওয়াইতে বসাইল। ভোরে ডাকিতে গেলে আসে নাই, অনেক বেলায় কাজে লাগিয়াছে, বাড়ীতে খাইতে গিয়া সময় নষ্ট করিলে পূরা মজুরী পরাশর পাইবে না।

তা হোক তার জন্য ওবেলা সব তোলা থাকিবে। ঘাটে স্নান করিয়া পেট ভরিয়া মাছ খাইয়া কামিনী ছেলেকে পাশে নিয়া একটু শুইয়াছে, কখন ঘুম আসিয়া গেল কে জানে। গড়াইয়া গড়াইয়া বেলা পড়িয়া আসিল, ঘুম ভাঙ্গিয়া আলস্যে হাই উঠিতে লাগিল। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলে কোথা হইতে কালো মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিতে সুরু করিল। কাল রাত্রের বৃষ্টি তবে শুধু বর্ষার জানান দেওয়া নয়, বর্ষা একেবারে আসিয়া পড়িয়াছে। ভামিনী তাড়াতাড়ি শিশি খুলিয়া কামিনীর পায়ে আলতা পরাইয়া দিল, বারবার আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে কামিনীও তাড়াতাড়ি জগতের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। তারও অনেক পরে কাছারি ঘরের চাল হইতে পরাশর নামিয়া আসিল। যত বৃষ্টিই পড়ুক আজ আর বাবুদের কাছারি ঘরে এক ফোঁটা জল পড়িবে না।

কালো কালো মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে চাহিয়া পরাশর গভীর তৃপ্তি ও গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

পারিবারিক

ভাবতে ভাবতে মা আবার বলে, কেউ ষ্টেশনে গেল না, জামাই মানুষ—

ইতিমধ্যেই মা দু'তিনবার কথাটা বলেছে, বনমালী একবার। আলোচনাও হয়ে গেছে যেটুকু হবার। এবার আর কেউ কান দেয় না কথাটায়। নন্দিনীর মনেই বিষয়টা সবার বেশী গুরুত্ব পাওয়া স্বাভাবিক, সেই আরেকবার বলে, পা তো আছে, চলে আসবে। কে যাবে এ বিষ্টিতে? নতুন তো নয়!

নিশ্চিন্ত ভাবেই বলে নন্দিনী, মিষ্টি করে একটু হেসে। বেশী যে পুরোণো নিখিল তা নয়, তবে বাড়ীর লোকের দুর্ভাবনা সামলানোর দায়িত্ব তো তারই! যদিও আগের মত দুর্ভাবনা শত আনকোরা জামাইও বোধ হয় কোন বাড়ীতেই আনতে পারে না আর, বাস্তব ওসব বাড়াবাড়ি চেপে পিষে শেষ করে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে মা আবার বলে, দু'তিনবার বলা কথাই বলে, কার ওপর রাগ করে যে শ্লেষ্মায় ভাঙা গলা চড়ায় ঠিক বোঝা যায়না,—চিচিংঙা খাবে জামাই, চিচিংঙা? বলি. জামাই এসে শুধু চিচিংঙা খাবে?—

খেতে হলে খাবে! এবারও নন্দিনীই কথা কয়, সবাই যা খায়, তাই খাবে!

যাবে যাবে, সব যাবে!—রাখাল ক্রুদ্ধ আপশোষের সঙ্গে মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, ধর্ম ভাসিয়ে দিলে থাকে কিছু! ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে-নিতে না পারলে কোন জাত টেঁকে।

কেউ কান দেয় না।

বাজার কাল করে রাখা হয় নি। যদি আসে নিখিল ভোর ভোর

এসেই পৌছবে, বাজার করার যথেষ্ট সময় থাকবে। আগে থেকে বেশি ও বিশেষ বাজার করে রাখলে যদি সে না-ই আসে! ফেলা অবশ্য যাবে না কিছুই, খাবার লোকের সংখ্যা মোটেই কম নয় বাড়ীতে কিন্তু খরচ তো আছে, অকারণ বাড়তি খরচ। আজ না এলে কাল হয় তো নিখিল আসবে।

আজ যদি আসে, বৃষ্টি মাথায় করেই একজন কেউ বাজার যাবে। যা পায়।

তবে বাজার আজ বসবে না।

এ এক সর্বনাশা দারিদ্র্য ঘনিয়ে এসেছে চারিদিক থেকে অকথ্য অদ্ভুত। তিন তিন জন চাকরী করে বাড়িতে আরও দু'জন এই কদিন আগেও করত—বেকার হয়েছে খুবই সম্প্রতি, একজনের স্থায়ী গভর্ণমেন্ট সার্ভিস। আজ অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রায় নুন আনতে পান্তা ফুরোবার মত। মোট জড়িয়ে নেহাৎ কম হয় না মাসিক উপার্জ্জন, দুশো টাকার বেশি, কিন্তু এমন আগুন লেগেছে জিনিষপত্রে সব যে মাসের গোড়ার দিকেই চড় চড় করে পুড়ে যায় প্রায় তার সবটাই, অর্দ্ধেকের বেশী যে বাকী আছে মাসটা, সেটা কিসে চলবে কেউ ভেবে পায় না!

অসুখ বিসুখও যেন পাল্লা দিয়েছে। অসুখ সংসারে লেগে থাকেই, চিরদিন থেকেছে সবার বাড়ীতে, কিন্তু এ যেন রোগের নিত্য বাজার হাট, সমারোহ।

কাগজে বিজ্ঞাপনে উপদেশ ছাপা হয়, অপব্যয় কোরো না, অদরকারী কিছু এমন কিনো না, টাকার দাম বাড়বে পরে জিনিষ সস্তা হবে, এখন শুধু জমাও!

নন্দিনী খিল খিল করে হাসে, কি জমাবে দাদা? খোলামকুচি? অদরকারী জিনিষ যেন কেউ কিনতে পারে!

মাটির মাশুল

রাখাল বড় ভাই, সে হাসে না। বুড়োটে বাপ বনমালী, সেও নয়। মেজ ভাই দিব্যেন্দু যেন মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতেই শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সেজ অসীম নিঃশব্দে হাসে, অল্পদিন আগে ছাঁটাই হওয়া এবং তার কিছুকাল আগে বিয়ে করে থাকা সত্ত্বেও! জোরে হাসে কল্যান, সুমতিরা। নন্দিনীর বলার ভঙ্গিটা বড়ই হাস্যজনক ছিল।

পারিবারিক গালগল্পের বা সবাই মিলে কাগজ পড়ার বৈঠক নয়, সকাল বিকাল ওরকম জমাট বাঁধার মত গুরুত্ব কোন পরিবারের আছে কিনা কে জানে! বাইরে শেষরাত্রি থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি, তাই। বাড়ীর কাঁচা অংশের খড়ো ঘর দু'খানার এবং রান্নাঘর ও গোয়ালঘরের চালা সারাই হয় নি চার বছর, জলে ভেসে গেছে। গোয়ালটা শূন্য, বছর দুই গরু নেই, চালাটা বর্ষার জলে গলে গেলেও কিছু আসে যায় না। কিন্তু দু' দু'ভাগে ভাগ করা চালা ঘর দুটির চারিটি শোয়া বসার কামরা থেকে বিছানাপত্র জামা কাপড় সব সরিয়ে আনতে হয়েছে বাড়ীর এই পাকা অংশে। সাত বছর আগে, যুদ্ধের গোড়ার দিকের সেই ইংরাজী একচল্লিশ সালের মধ্যে যে পয়লা বৈশাখটি ছিল, সেদিন ভিত্তি পত্তন করে, তিন মাসের মধ্যে দু'খানা পাকা ঘর তুলে দিয়েছিল ঠাকুর্দা প্রিয়রঞ্জন। দিয়ে, দু'মাসের মধ্যে মারা গিয়েছিল। সারাই চুণকাম কিছুই আর হয় নি এ পর্য্যন্ত, তবু আকাশটা বর্ষা হয়ে ভেঙ্গে পড়লেও এদুখানা ঘরে জল পড়ে না। বাতাস থাকলে অবশ্য দু'টো জানলা দিয়ে ছাঁট আসে, আলকাতরা মাথানো তক্তা জোড়া দেওয়া জানালার পাট বন্ধ করলেও। জানালা দুটির সংস্কার করার কথা গম্ভীর ভাবে আলোচনা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু কাজে এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নি।

পাশাপাশি দু'খানা ঘর, মাঝের দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা দরজা। লম্বা একটা হল করার সাধই যেন ছিল প্রিয়রঞ্জনের, মাঝখানে দেয়াল

তুলে ভাগ করতেই চায় নি, কিন্তু সেটা অবাস্তব অনর্থক সাধ বলে দু'টো ঘর করতেই হয়েছে। জিদ বজায় রাখার জন্তই যেন বুড়ো লম্বায় চওড়ায় খাপছাড়া এই সাই দরজাটি বসিয়ে গেছে, কপাট খুলে রাখলে যেন মনে হয় ঘর বুঝি দুটি নয়। ইটের চেয়ে অনেক বেশী দাম কাঠের। আর কি মানে হয় বুড়ের পাগলামির ?

ঘর দুটিতে থাকে বড় রাখাল আর মেজ দিব্যেন্দু। রাখালের ছেলেমেয়ে এক পাল, দিব্যেন্দুর কিছু কম। ঘর নিয়ে দিব্যেন্দু সব চেয়ে বেশী ঝগড়া করেছিল বলেই বোধ হয় তার ঘরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ সমান চাঁচের বেড়ায় আড়াল করে বনমালী বসবাস করে। বাড়ীর মা, বনমালীর স্ত্রী, স্বামীর কাছে বহুকাল শোয় না। সে যেমন শীর্ণ, চুল ওঠা কপালে তার যেমন চওড়া সিঁদুর, তেমনি সে পেট রোগা। চালা ঘরেই সে থাকে, পুবের ঘরটায়। ঘরের পিছনেই ডোবা আর জংগল, বেতবন।

বর্ষা সবাইকে কাঁচা অংশ থেকে পাকা অংশে আনলে মাঝের দরজায় মরচে ধরা শিকলটা অগত্যা খুলতে হয়। বনমালী চাঁচের বেড়ার ওদিক থেকে বেরিয়ে আসে এদিকে, তার অংশের পাশের জানালায় ছাট আসে বৃষ্টির মত। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জির ওপর আঠার বছরের পুরাণো গরমকোট চাপিযে কলার ফুটো কম্ফর্টার জড়িয়ে সে যেন বীরের মত আত্মরক্ষার যুদ্ধ করে।

নন্দিনী কাগজ পড়ে সকালে।

গতকালের মফস্বল এডিসন সহরের পরশুর কাগজ।

কাগজ এলে টানাটানি হয়। একজনের হাতে কাগজ ধরা থাকে, পিছন থেকে তিন চার জোড়া চোখ কাগজের পৃষ্ঠা হাতড়ায়। নেহেরু মেনেছে ? জিন্না ? দাঙ্গা কমেছে না বেড়েছে ? কি

ঘোষণা গান্ধীর প্রার্থনায়? জেলা সহরের গা-ঘেঁষা গাঁ ধুলচারিতে নুরুল হোসেন আর রাঘব আচার্য্য যে দুটো নৌকা আর এগারজন গুণ্ডাকে দড়ি বেঁধে রাখায় হৈ চৈ পড়ে গেছে সহরে সে খবরটা কি ছাপিয়েছে কাগজে? কল্যাণ পাঠিয়েছিল খবরটা, তাদের কল্যাণ! সাতগাঁর গুলি চালাবার খবরটা—ধানের জন্য তিনটা চাষা খুন আর একুশটা জখম—হাবিজুলের বৌটার ওপর— ?

নন্দিনী টাট্‌কা কাগজের কাছে ঘেঁষে না। ও রকম ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা খবর পড়ায় তার তৃপ্তি নেই। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে সে তার অল্প বিদ্যা নিয়ে নীচু ক্লাশে বাংলা শেখায়, হাজিরা নিয়ে বড় কড়াকড়ি। সেক্রেটারি কুমুদবাবু একটু তাকে আদর করতে চেয়েছিল, প্রথমে হেডমাষ্টার মশায়ের ঘরে, তারপর জেলা বোর্ডের অফিসে তার খাস কামরায়।

হাজিরার কড়াকড়ি চলছে, ক্লাশ নেবার খুঁটিনাটি কৈফিয়ৎ। কবে জবাব দেয় ঠিক নেই।

অনেকক্ষণ তন্ন তন্ন করে কাগজ না পড়লে, শুধু মাউণ্টব্যাটনের খবর নয় বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত বুঝে শুনে না পড়লে তার ভাল লাগে না।

খবর আর বিজ্ঞাপন সব এক ধাঁচের—ধর্ম-শক্তি বৃদ্ধি এবং যৌন শক্তি বৃদ্ধি।

পড়তে পড়তে খিল খিল করে হেসে ওঠে বটে, পরিবারের কাউকে রাগায় কাউকে হাসায় বটে, বুকটা তার জ্বলে যায়। এমন একটা কাগজও কি এই স্বাধীনতা পাওয়ায় দেশে হয় না যাতে সত্যি খবর সত্যি বিজ্ঞাপন ছাপে?

কেন মিছে খবরটা কি ছেপেছে?

অর্দ্ধেক মিছে খবর, কত খবর বাদ দিয়েছে!

বড় গাল দিযে লেখে নিজেদের যেন কোন দোষ নেই। ঝগড়া তো আরও বাড়বে ওতে!

বাড়ুক। আমরা সইব না আর। কেন সইব? ব্যাটাদের মেরে লোপাট করে—ও খবরটা কিন্তু মিছে। রাজপুরে একটা জোতদারের ঘরও পোড়ায় নি। তুই জানলি কি করে পোড়ায় নি? মিছেমিছি একপাল লোককে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে এসেছে! ওরা তো স্বদেশী করে নি যে ধরবার জন্য—

রাজপুরে গিয়েছিলাম না কাল? কোন জোতদারের ঘর পোড়ে নি। বরং কটা চাষীর ঘরে আগুন দিয়েছিল।

খবরের কাগজের খবর আর মন্তব্য নিযে রোজই ভাসা ভাসা কথাবার্ত্তা হয়। ধীরে ধীরে একটা পারিবারিক অভ্যাসে পরিণত হযেছে। চারিদিকে এত সব বিরাট ঘটনা দুর্ঘটনের সমারোহ, এই ছোট্ট সহরেও যার ঢেউ এসে লাগে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের জীবনের সঙ্গে যোগ আছে অনুভব করে, কি হল কি হবে জানবার আগ্রহ সকলের মনেই। কেমন একটা অসন্তোষ, অতৃপ্তি জাগে কাগজ পড়ে। আরও কি জানতে চায, কি ভাবে জানতে চায় কেন জানতে চায় ভাল বোঝে না কেউ, শুধু মনে হয় কেমন যেন একপেশে ব্যাখ্যা মন্তব্য নির্দ্দেশ কাগজটার, খবর পরিবেশনেও। ছাঁটাই বাছাই করা ঘুরিয়ে বলা সত্য মিথ্যার মেশাল দেওয়া ঘণ্টের মত, মন পোড়ানো ঝাল দেওয়া।

দেরীতে আসা বছরের প্রথম খাঁটী বর্ষা একটু অপ্রস্তুতে ফেলেছে সকলকে। রান্না চড়াবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে দেখা গেছে, এবছর আর কোন মতেই কাঁচা ঘরে রান্না করা সম্ভব নয় বৃষ্টির সময়, রাঁধতে হলে এই পাকা ঘরের মধ্যেই আয়োজন করতে হবে। কয়লার ছোট আলগা

উনানটে এনে ভিজে কাঠ জালিয়ে ডাল ভাত সিদ্ধ করার আয়োজন খানিকটা এগিয়েছে। সহরে কয়লা মেলে না, একটা কেলেঙ্কারি হব হব হয়েছে কয়লা চালান ও বিতরণের ব্যাপারে সহরের কর্তা ব্যক্তিদের নিয়ে—ধামা চাপা পড়ে যাবে। বাজার আজ হবে না জানা কথাই। ডাল ভাত হলে চিচিংগার চচ্চরি হবে। তরিতরকারীর মধ্যে অদ্ভুত রকম সস্তা চিচিংগা, ঝিঙাও প্রায় অর্দ্ধেক দামে বিকোয়। সকালে তরকারীর ঝুড়িতে শাক রাঁধার জন্য আগের দিনের সঞ্চয় করা ভাঁটা মূলোর পাতাগুলি আর চিচিংগা থাকে—লুকানো একটা পটোল বা ছোট একটা কানা বেগুন কোন কোন দিন দেখা যায়।

স্কুল হয়তো ছুটিই হয়ে যাবে আজ, বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত অফিস কাছারিও বসবে না। ঝড় বাদলেও হাকিম হুকিম ছাড়া সবার কাছারি যাওয়ার আজ্ঞা আছে কিন্তু ওনারা নিজেরা যান না বলে না গেলেও চলে। সরকারী দপ্তর গুলিতে সব কিছুর সঙ্গে এসব কড়াকড়িও শিথিল হয়ে এসেছে, নিয়মকানুন মানার দিকে নজর দেবে কে, সবাই যখন পচন বাড়াতে ব্যস্ত তাতেই যখন লাভ। রাখালেরও আগের দিনের তাগিদ নেই, সুনীল নতুন কাজে ঢুকেছে, তারও না। তবে বিমলকে যেতে হবে যথা সময়ে, তার বেসরকারী চাকরী।

হঠাৎ বৃষ্টি ধরে গেলে ছুটতে হবে সকলকেই—নুন ভাত তো পেটে দেওযা চাই। তাছাড়া, খিদেও তো আছে।

আমরা বাঁচবো? বাঁচবো না—ধ্বংস হয়ে যাব। ধর্ম্ম ভুলে গেছি, ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারি না—যে জোর দেখায় তার সঙ্গেই আপোষ। কি করে বাঁচবো? তরি-কারীর ঝুড়িটার দিকে চেয়ে থেকে রাখাল চড়া গলায় ঘোষণা করে, ঘরে ধোঁয়া নইলে যেন তার কথার মানে অস্পষ্ট করে রাখবে।

মাটির মাশুল

সবাই শোনে, কেউ কান দেয় না। শুধু চচ্চরি দিয়ে ভাত খাওয়া তো নয়, অনেক কিছুই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলে সর্ব্বদাই তাকে দিয়ে কথাটা ঘোষণা করাচ্ছে। কত শোনা যায়?

ছেলেপিলে কাঁদে ককায়, ঝগড়া করে, চলতে থাকে তাদের সামলানো, শান্ত করা—কেমন যেন সমারোহ ছাড়াই! আগের দিনে ঘরবাড়ী সরগরম হয়ে উঠত বাচ্চাদের চেঁচামেচি কাঁদাকাটার সঙ্গে তাদের আওয়াজ ছাড়িয়ে ওঠা বড়দের বিরক্তির ঝঙ্কার মিশে। তেমন বিরক্ত কেউ যেন আর হয় না, এমন অসহ হয়ে উঠেছে বেঁচে থাকা, তবু অথবা হয় তো সেই জন্যেই—আশ্চর্য্য এক ধৈর্য্য এসেছে সবার মধ্যে, অপরূপ এক সহ্য শক্তি। তবে সে রকম আদরও কেউ আর করে না, বাচ্চা কাচ্চাকে হরদম বুকে চেপে চুমু খেয়ে সোনা আমার মাণিক আমার বলে বলে আবেগে গলে গিয়ে এবং গলিয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে—কল্পনার মোটা সোটা অমন সুন্দর কোলের ছেলেটার পর্য্যন্ত ভাবাবেগের বাজারে দর নেই। এখনো মাই ছেড়ে রোগা বিচ্ছিরি হতে পারে নি ছেলেটা, বুকে দুধও পায় মোটামুটি—কল্পনার স্বাস্থ্য অসাধারণ ভাল ছিল।

আধ ভেজা কাপড় পরে আছে কল্পনা, এখানে ওখানে ছেঁড়া। তা, ছেঁড়া কাপড় সবাই পরে, যে অবস্থায় পৌঁছবার অনেক আগেই কাঁথা ন্যাকড়া হযে যেত ধুতিশাড়ী, সে অবস্থাতেও! তবে, একটু জ্বর এসেছে কল্পনার এই যা। এসেছে দিন তিনেক।

দালানে মেলা বড় বৌ অতসীর শাড়ীখানা শুকিয়েছে। রেশনের নতুন শাড়ী।

দাও না দিদি ভিজে কাপড়টা ছাড়ি? শীত করছে।—হঠাৎ কল্পনা অনুরোধ জানিয়ে বসে, একটু যেন দাবীর মত জোরের সঙ্গে। মনে তার একটা আশা ছিল!

নেয়ে উঠে আমি পরব কি?

জ্বরতপ্ত মুখ আরও লাল হয়ে ওঠে কল্পনার।—

এবারও রেশনের কাপড়টা তো কায়দা করে—মরুক গে যাক্।

ঝিমিয়ে পিছিয়ে যায় কল্পনা। জ্বরের দুর্ব্বলতায় নয়, কলহ করার তেজ জ্বরে বাড়ে বই কমে না,—কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পায় না মনের মধ্যে!

কি কায়দা শুনি? ঘাড় তোলে অতসী, কিসের কাযদা? শোন দিকি কথা একবার!

শঙ্কিত চোখে নন্দিনী চেয়ে থাকে। কিন্তু আর এগোয না বিবাদ, চোখে চোখে খানিক তাকিয়ে থেকে দু'জনে ঝামটা মেরে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ঝগড়াঝাঁটিরও যেন কি হয়েছে আজকাল। জমে না!

ভিজে কাপড় পরে আছো? বলতে পারো না? বললে একখানা শুকনো কাপড় তোমার জোটে না? নাও, এটা পরো।

কল্যাণ মেজ বৌদিকে একখানা সরুপাড় ধুতি এগিয়ে দেয।

কল্পনা হেসে বলে, ধ্যেৎ।

কেন? কি হয় পরলে? নন্দিনী বলে, কত সধবা থান পেলে বর্ত্তে যাচ্ছে!

কল্পনার বড়ই শীত করছিল, দ্বিধা ভরে বলল, পরব?

তার দ্বিধা আর অস্বস্তি দেখে নন্দিণী ধুতিটা নিযে নিজের পরণের শাড়ীখানা ছেড়ে ফেলল। শাড়ী তাব আরও আছে, তবে একটু ভাল শাড়ী সে কখানা, সর্বদা পরতে মাযা হয়। তাছাড়া, কিছুক্ষণের জন্যও ধুতি পরে থাকার কথা ভাবতে তার নিজেরও যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ওটাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

মাটির মাশুল

বেলা দশটা নাগাদ বৃষ্টি কমে এল। সুনীল চিচিংগা চর্চ্চরি দিয়ে পাতলা খিচুড়ি খেয়ে তখন বেরোবার উপক্রম করছে। ভাল ছাতিটা সে নিয়ে যাবে না বাড়ীর দরকারে রেখে যাবে, এই দাঁড়িয়েছে পারিবারিক সমস্যা। দেরী তার হয়েছে, আর একটু দেরী করে দেখবে বৃষ্টি ধরে কি না? সৌভাগ্যের বিষয়, আপিস বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয় সুনীলের, মোটে দশ বার মিনিটের পথ। বৃষ্টি একবার ধরলে সেই ফাঁকে ছাতি ছাড়াই চলে যেতে পারবে, আরেক দফা বর্ষণ সুরু হবার আগেই।

বাড়ীর আর দু'জন আপিস যাত্রীও ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময় নিখিল এল সাইকেল রিক্সায়। ভিজে সে চুপশে গেছে, তার জিনিষপত্রও রেহাই পায় নি। জিনিষ সে সামান্যই সঙ্গে এনেছে, মোটে দু'দিন থাকবে। দশ দিনের ছুটি, তার মধ্যে তিনটে দিনই আসা যাওয়ার জন্য বরাদ্দ। দেশে নিজের বাড়ীতে তিন দিন থাকতে হয়েছে, একরাত্রি গেছে সেখান থেকে এখানে আসতে। নন্দিনী আগে থেকে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে থাকলে ভাল হত, তা সে তো আর হবার নয়। সাতমাস বলে নয় শুধু, এপথে রাত্রে মেয়েছেলের যাতায়াত যেমন জঘন্য তেমনি বিপদজনক।

রিকসাচালক ছোঁড়াটা আরও বেশী ভিজেছে, পিঠের কাছে দু'ফালা হয়ে ছেঁড়া খাকি ময়লা সার্টটা এঁটে গিয়েছে পিঠের চামড়ার সঙ্গে। ব্যাগ আর বিছানা ঘরে পৌঁছে দিয়ে সে ঘরের মধ্যেই দরজার চৌকাঠের কাছ ঘেঁষে পরিবারটির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জামাটা খুলে নিংড়ে নেয়, কাপড় চিপে চিপে জল ঝরায়। জামা দিয়ে গা মুছে সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টি থামার জন্যে একটু অপেক্ষা করাই বোধ হয় তার মতলব।

বেশী পয়সার লোভেই সে অবশ্য এই বৃষ্টিতে নিখিলকে পৌছে দিতে রাজী হয়েছে, তবু তাকে রাস্তায় নেমে যেতে যেন বলা যায় না, অন্ততঃ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে না দিয়ে।

শুধু রাখাল নীচু গলায় বলে, ব্যাটা মুসলমান কিনা না জেনে?

সে কথায় কেউ কাণ দেয় না।

ইলিশ মাছ দু'টি হাতে করেই নিখিল নেমেছিল। মস্ত দুটো ইলিশ, বেশ চওড়া।

মাছ এনেছো? মা যেন আশীর্ব্বাদ করে জামাইকে।

ভিজে কাপড় ছেড়ে নিখিল বনমালীর এক পায়ের পাতায় এক হাতের একটি আঙুল ছুঁইয়ে প্রণাম পর্ব শেষ করে, আর কারো পায়ের দিকে তাকিয়েও ছাখে না।

বলে, খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয় মাছ দু'টো।

সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল।

খারাপ হয়ে যাবে না? নন্দিনী বলে মুখ ভার করে,এভাবে আনলে কখনো মাছ থাকে?

একটু বরফ পেলাম না। থলিটাতে বড় বড় বরফের চাকা ভরে—

ভেজে আনলেই হত!

আসবার সময় কিনে নিলাম বাজার থেকে। ভাবলাম বরফ কিনে—

যাক্, বেশ করেছো। দুধ ছাড়া চা খেতে হবে কিন্তু। শুধু এইবার—পরের বার দুধ এসে যাবে। তোমার জন্য চিনি তোলা আছে, গুড়ের চা নয়।

এবার নন্দিনী হাসল।

ট্রামে

কিছুদিন হল চাকরী করছি।

আজ বাদে কাল চৈত্র শেষ হয়ে যাবে। বেলা দশটাতেই রোদের তেজের বাড়াবাড়ি রাগিয়ে দেয়। সহরতলীতে বাড়ী। মিনিট চারেক হেঁটে বড় রাস্তায় এসে ট্রামের জন্ত অপেক্ষা করছি। স্নানের সিক্ততা ভাল করে উঠে যাবার আগেই শরীরটা কাপড় জামার নীচে বেশ ঘেমে উঠেছে। ট্রামে উঠলে আরাম পাব—ফ্যান আর ট্রাম চলার বাতাসে।

দু' স্টপেজ তফাতে ডিপোর সামনে ট্রামটি ছাড়বার জন্ত অপেক্ষা করছে দেখতে পাচ্ছি। একরকম খালি অবস্থাতেই ট্রামটি আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, ইচ্ছামত যে কোন সিটে বসতে পারব। কথাটা ভাবতেও বেশ আরাম অনুভব করি, নিজেকে রীতিমত ভাগ্যবান মনে হয়। সহরতলীতে ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি বাস করি বলেই তো দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট, পঁচিশ ত্রিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার ভয়ানক পরিশ্রম এড়িয়ে যেতে পারি। কালিঘাট পৌঁছবার আগেই সব সিট ভর্ত্তি হয়ে যাবে। দাঁড়ানো মানুষের ভিড় ক্রমে বাড়তে থাকবে, পাদানি পর্য্যন্ত সমস্ত ফাঁকা স্থানটুকুতে গাদাগাদি করে দাঁড়াবে সব কচি বুড়ো মাঝবয়সী আপিস যাত্রী—সায়েব আর টমিও থাকবে কিছু।

আমি বসেই যাব।

নিজের পছন্দ করা সিটে হেলান দিয়ে সিগারেট টানব আর দাঁড়ানো মানুষগুলির সান্নিধ্য অনুভব করতে করতে উপভোগ করব বসে থাকার আরাম। এতগুলি ভদ্রলোককে একসঙ্গে কষ্ট পেতে দেখে সমস্ত পথ পুলকিত হয়ে থাকব। আপিসের ছুটির পর অবশ্য দাঁড়িয়েই ফিরতে হয়। ডালহৌসী থেকেই গাড়ীগুলি বোঝাই হয়ে এসপ্ল্যানেডে আসে। বসে বাড়ী

ফিরবার একটা কৌশল অবশ্য আছে, কিছু সময় খরচ হয়। বিপরীত দিকের গাড়ীতে চেপে ডালহৌসী পাক দিয়ে এলে বসে বসেই বাড়ী ফেরা যায়। কিন্তু নিজস্ব নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে এতক্ষণ বসে কাজ করে আসার জন্যই বোধ হয় বসবার তাগিদটা তেমন জোরালো থাকে না। বোঝাই গাড়ীতেই উঠে পড়ি। ফার্স্ট ক্লাশে ওঠা অবশ্য একেবারেই সম্ভব হয় না, সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে ঠেসাঠেসি করে কোন রকমে দাঁড়ানো যায়। কিছু ধরে দাঁড়াবার দরকার হয় না, গাড়ীর থামা ও চলার টাল সামলাতে মানুষের অবলম্বন পাই। বেশ লাগে দাঁড়াতে। আরাম পাই। আনন্দ হয়। চারিদিক থেকে মানুষের নরম দেহের জোরালো চাপ, মানুষের ঘামের গন্ধ মানুষের নিশ্বাসের ভাপসা বাতাস আর মানুষের দেহের উত্তাপে জমজমাট ভেজা গরম, এসব যেন জীবন্ত করে তোলে আমাকে। গাড়ীর ভিড় দেখে ষ্টপেজে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটি মুখ বাঁকায়, তার কোমল তরুণ রোমাঞ্চময় দেহে চোখ বুলিয়ে মনে হয় ভিড়ের স্পর্শ ঢের বেশী স্নায়বিক ঢের বেশী উত্তেজক।

বাড়ী ফিরে খালি গায়ে দক্ষিণের খোলা বারান্দায় দাঁড়াই, দূর সমুদ্রের বাতাস সামনের জলা আর খোলা মাঠ ডিঙ্গিয়ে এসে প্রথমে আমাকে স্পর্শ করে সহরে ঢোকে। স্পষ্ট বুঝতে পারি সে শুধু বাতাস, নিশ্বাস নয়। দক্ষিণা বাতাসে গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেলে চান করি, খাবার খেয়ে খিদে মেটাই, চা পান করি। গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যা আসে।

ট্রাম এল।

তিনটি বাঙ্গালী পুরুষ আর একটি বিদেশী মহিলা ফার্স্ট ক্লাশে উঠেছে। লেডিজ সিটে না বসে মহিলাটি একেবারে সামনের বাঁদিকের সিটে

বসেছে। ওখানে বসার সুবিধা আছে। জানালা দিয়ে জোরে বাতাস গায়ে লাগে আর ঘাড় বাঁকিয়ে পাশের জানালা দিয়ে দ্রুত অপস্রিয়মান ঘরবাড়ী দোকান পাট দেখার বদলে সোজাসুজি সামনে তাকিয়ে দূরকে কাছে আসতে দেখে একটু সহজে সময় কাটানো যায়। আমি তাই মাঝামাঝি একটি সিটে বসলাম। সময় আমার কখনো কাটাতে হয় না, আপনিই কেটে যায়।

বিদেশী মহিলাটির পোষাক আর চেহারা দুই-ই বেশ জমকালো। ত্রিশ অথবা পয়তাল্লিশ বয়স উথলে ওঠা দুধের মত মাঝবয়সের যৌবন পরিপুষ্টির ফাঁকিতে ফেঁপে ফেনিয়ে উঠেছে। ট্রেনের মনে শ্রদ্ধাপূর্ণ লালসা যেন জাগাবেই, কিছুতে রেহাই দেবে না।

প্রত্যেক ষ্টপেজে লোক উঠে গাড়ী ভরে যেতে লাগল। পর পর বই হাতে দুটি মেয়ে উঠে একজন ডানদিকের এবং অন্যজন বাঁদিকের লেডিজ বেঞ্চ দুইটি দখল করল। কালীঘাট থেকে গাড়ী ছাড়বার পর দেখা গেল সাতজন দাঁড়িয়ে আছে। লেডিজ বেঞ্চ দু'টিতে দুজনের সিট খালি আছে, কিন্তু নারী জন্ম না নিলে সেটা দখল করা সম্ভব নয়। একটি মেয়ে অন্য বেঞ্চে উঠে গেলে অন্ততঃ নূতন আরেকটি মেয়ে গাড়ীতে না উঠা পর্য্যন্ত দুজন পুরুষ বসতে পারে। কিন্তু দু'জনেই তারা নির্ব্বিকার ভাব ফুটিয়ে মেরুদণ্ড আর ঘাড় সিধে করে বসে আছে। মেয়েদের জন্য রিজার্ভ করা সিট, পুরুষের সিভালরিহীনতার প্রামাণ্য বিজ্ঞাপন, পুরুষের পাশে বসলে নারীদের অশুচি হবার ঘোষণা। লজ্জায় আরেকটা সিগারেট ধরালাম।

গত রবিবার একজন ভবানীপুরে আমাকে গ্রেপ্তার করে তার বালীগঞ্জের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। লেখা শোনাবেন। শুনিয়ে প্রশংসা শুনবেন। রূপে গুণে যৌবনের তেজে স্বাধীন চিন্তায় কর্ম্মপটুতায়

পুরুষকে সমান ভাবায় আর যুগান্তর ঘটাবার পিপাসায় তিনি অসাধারণ। আগাগোড়া সমস্ত পথটা দাঁড়িয়ে যেতে হয়েছিল। নেমেই বলেছিলেন দেখলেন? একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখেও কেউ একটা সিট অফার করল না! এই সব অমানুষ আমার দেশের মানুষ! আমি কিছু না ভেবেই বলেছিলাম কেন, অনেকেই তো দাঁড়িয়েছিল। তিনি মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলেছিলেন আপনি আবার অনেক মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন কোথায়?

তখন বলেছিলাম, কি জানো পুরুষের পাশে তুমি বসবে এটা কেউ ভাবতেও পারেনি। বেয়াদবি করতেও কেউ সাহস পায়নি। একজন উঠে সিট অফার করলে তুমি বসতে?

নিশ্চয় বসতুম! কেন বসব না! আর বসি বা না বসি—

সে বসত না। আমি জানি সে বসত না। স্পর্শ বাঁচিয়ে তাকে দাঁড়াবার স্থান দিতে সকলে যে ভাবে গাদাগাদি ঠেসাঠেসি করে তালগোল পাকিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল সেটা গ্রহণ করেছিল সকলের উচিত কাজ বলে, তার প্রাপ্য বলে। এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করেনি· মর্মাহত হয় নি।

সামনের সেই বিদেশী মহিলাটির পাশের স্থানটি খালিই পড়ে আছে।

একজন দাঁড়ানো যাত্রীকে বললাম, ওখানে গিয়ে বসুন না?

ভদ্রলোক পানের রসে ঢোক্ গিলে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অকারণে একটু হাসল, শুধু বলল হেঁ হেঁ হেঁ—

আমি সাহস দিয়ে বললাম, ওটা লেডিজ সিট নয়।

সে একগাল হাসল, ঠোঁট বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ার আগে শুষে নিল, কত লোকের দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষিত হয়েছে চট করে

দেখে নিয়ে বলল, আমরা ওসব পারিনে মশায়। সঙ্কোচ লাগে আর কি, বুঝলেন না? অভ্যেস তো নেই!

তখন তাকিয়ে দেখি পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবীতে আবছা ঢাকা গেঞ্জি গায়ে ঘাড়ছাটা এক ছোকরা দাঁড়ানো মানুষগুলিকে বেপরোয়া ঠেলে ঠেলে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সোজা গিয়ে সে বিদেশী মহিলাটির পাশে বসে পড়ল, মুখের বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে তার মুখের সামনে হাত বাড়িয়ে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল।

কণ্ডাক্টর বলল, টিকেট?

ছোকরা বলল, মন্‌থিলি। দেখনে মাংতা? ওই হোথায় একদফা দেখিয়েছি কিন্তু বাবা হ্যাঁ। দেখো আবার দেখো।

কণ্ডাক্টর যুবক, মুখখানা সুশ্রী। দাড়ি কামিয়ে মুখে স্নো মেখেছে বলে মনে হল। চোখে মুখে কলেজ ষ্টুডেণ্টদের মার্কা মারা সুপরিচিত প্রতিভার নিবু নিবু ছাপ দেখেও স্বস্তি বোধ করলাম। কয়েক বছরের মধ্যে মুখের চামড়া শক্ত হয়ে এ কলঙ্ক ঢেকে যাবে। প্রতিফলিত উজ্জ্বলতা নিভে গিয়ে দুটি চোখে দেখা দেবে বজ্র ও বিদ্যুৎ ভরা মেঘের মত খাঁটি বিদ্রোহ ভরা ঘৃণার ছায়া।

পাঁচটার কিছু আগেই আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আজ দেখলাম প্রথম বোঝাই ট্রামখানার সেকেণ্ড ক্লাশেই ভীড় বেশী। ফার্ষ্ট ক্লাশে দাঁড়ানো চলে। উঠবার ও দাঁড়াবার জন্ম স্থান সৃষ্টির লড়াই শেষ হলে বহুদিনের বদভ্যাসের ফলে অজানা নূতন অভিব্যক্তি আবিষ্কারের আশায় দৃশ্যমান মুখগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। মুখে মুখে মিল নেই, কিন্তু সব চেনা মুখ, আত্মীয়ের মুখ। এই অঘটনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, বিশেষ খারাপ লাগে না। তাই অনায়াসেই অন্যমনস্ক হয়ে

গেলাম। আমার অতি নিকটে যে একটা অন্যায় ঘটছে সে বিষয়ে তাই সচেতন হলাম খানিক পরে

সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাঁটি বিদেশিনী কি ফিরিঙ্গি বিদেশিনী ঠিক বুঝলাম না। তরুণী বিনা রোগ ব্যারামে ছিপছিপে এবং মনোরম শ্রীমতী। লেডিজ সিটগুলি ভরে গেছে। দরজা আর লেডিজ সিটের মাঝখানে একজনের যে সিটটি থাকে সেটি দখল করে আছে একজন বাঙ্গালী যুবক—সবল সুস্থ চেহারার গম্ভীর শান্ত ভদ্র যুবক। সামনে মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে এতখানি নির্বিকার চিত্তে বসে আছে যে তার নিষ্ক্রিয় অভদ্রতা ঔদ্ধত্যের মত বিশ্রী ও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে। ক্ষুব্ধ হলাম এবং একটু খুসীও হলাম।

ভিড়ের ঠেলায় বিদেশিনী মেয়েটিকে একটু ধাক্কা দিয়ে ফেললাম। ক্ষমা চাইবার আগেই সে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে আর সায় দেবার ভঙ্গিতে দু'বার মাথা নেড়ে যেন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না, কারো কোন দোষ নেই, বর্ত্তমান অবস্থায় এটা একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

তখন আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। মনে হল সমষ্টির সমস্যা ছাড়িয়ে ব্যাপারটা এখন ব্যক্তিগত প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। ছেলেটিকে বললাম, আপনি একটু উঠলে—

সে বলল, কেন?

তার মুখের ভাবের এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটল না।

আমি চুপ করে গেলাম। খানিক পরে একটি বাঙ্গালী তরুণী উঠে বিদেশী মেয়েটিকে নিমন্ত্রণ করে তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে সে ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছে লক্ষ্য করলাম—কি গভীর অবজ্ঞা আর তিরস্কার তার বড় বড় দুটি চোখে।

মাটির মাশুল

বিদেশী মেয়েটি বলল, প্লিজ—

দেশী মেয়েটির ডান হাতের কনুই তার পাঁজরার নীচে খোঁচা দিচ্ছিল। দেশী মেয়েটি নীরবে তাকে রেহাই দিয়ে চোখের বজ্রে ছেলেটির পিপাসু চোখ দু'টিকে কানা করবার চেষ্টা করেই প্যানেলের একটি বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে রইল। একটি ফাঁপানো বেলুনের মত একটি শিশুর ছবি। কোন খাদ্য খাওয়ালে শিশুরা এরকম ভয়ঙ্কর মোটা হতে পারে তারই বিজ্ঞাপন। অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবে না, দেশী মেয়েটির চোখের বিদ্যুৎ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। দেখলাম বিজ্ঞাপণের কথাগুলি পড়তে তার ঠোঁট নড়ছে।

বিচারের জন্য, বিশ্লেষণের জন্য, সমালোচনার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কি দিয়ে বিচার করব, ওর মনের সত্য মিথ্যার দলিল তো পাই নি আমি! গাড়ীর আর যে কোন লোক ওখানে বসে যদি জিজ্ঞাসা করত, কেন? আমি তার মানে বুঝতাম! এ ছেলেটি আমার অনুরোধের জবাবে প্রশ্ন করেনি, বলে দিয়েছে সে উঠবে না। একটি মেয়ে যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে তা' গ্রাহ্য করে না। মেয়েটির সুঠাম সুন্দর দেহ তার চোখ দু'টিকে আনন্দ দিচ্ছে বলেই তার কাছে মেয়েটির কোন পাওনা সৃষ্টি হয় নি।

পরের ষ্টপেজে গাড়ী থামতে গলাবন্ধ কোটগায়ে ছাতি বগলে পুঁটুলি হাতে প্রৌঢ় বয়সী এক ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্ত ভাবে আগে একটি ঘোমটা টানা মহিলাকে গাড়ীতে তুলিয়ে নিজেও উঠে পড়ল। কোন্ ম্যাজিকে জানি না সেই জমজমাট ভিড় ফাঁক হয়ে মহিলাটিকে এগিয়ে যাবার পথ করে দিল, সেই পথে পিছু পিছু তার সঙ্গীও তাকে অনুসরণ করল। সেই ছেলেটি তাঁর একজনের সিটছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটিকে উদ্দেশ করে বলল, এখানে বসুন।

চেয়ে দেখলাম তার মুখের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নি।

বাড়ী ফিরে বারান্দায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে দক্ষিণা বাতাসে ঘাম শুকিয়ে স্নান করলাম। পেট ভরে খাবার খেয়ে পান করলাম চা। গড়িয়ে গড়িযে সন্ধ্যা নেমে এল। লেখার তাগিদ ছিল, কিন্তু আজ আর লেখা হবে না। মাথায় ভাবনা জুটেছে। টেবিলে ভারি কাঁচ চাপা কাগজ আর কলমটির দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বারান্দায় গিযে দাঁড়ালাম। একতলার কোণের ঘরে রেডিওতে গান হচ্ছে। পাশের বাড়ীর মেযেটি তার মিষ্টি গলা সাধছে। দূরে কে যেন বাঁশীও বাজাচ্ছে করুণ সুরে। বড় রাস্তা থেকে ট্রাম চলবার আওযাজ কাণে এল। তাকিয়ে দেখি যে ট্রামগাড়ীটা বাড়ীটার আড়ালে পড়েছে, কিন্তু উপরের তারে নীলাভ দ্যুতির চমক তুলে কি যেন ইঙ্গিত করছে আমাকে।

ধর্ম্ম

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দুজনের বেধে যায। তীক্ষ্ণ ধারালো কথায় পরস্পরকে এরা কুচি কুচি করে কাটতে থাকে, মুখের সঠিক সূক্ষ্ম ভঙ্গী সমর্থন করে চলে কথাকে, ভিতরের জ্বালার তাপে আর আক্রোশের চাপে ফর্শা মুখ দুটি লাল হয়ে যায়—তমসার বেশী হয়। সৌম্যেনের দাড়ি কড়া, অনেক যত্নে কামানোর পরেও কূপের ভিতর থেকে লোমের গোড়া উঁকি দেয়।

তমসা বেশ ফর্শাই।

গলা তাদের চড়ে না, বরং কথার ধার বাড়বার সঙ্গে আওয়াজ

কমে আসে। চাপা হিসহিসানির মত শোনায় সময় সময়, তাদের ভেতরে যেন সাপ আছে, ঝগড়া করছে সেই সাপ দুটি, তারা নয়। বুদ্ধি চোখা, জটিল চিন্তা নিয়ে দ্রুত পাক দেওয়া মনের অভ্যাস, চিন্তার স্পিডও অনেক। গলার জোরে গায়ের ঝাল ঝাড়বার দরকার তাদের হয় না, গালাগালি তো একেবারেই অচল। নতুন নতুন বলার কথা খুঁজে না পেয়ে একটিমাত্র খোঁচার পিছনে তেজ ঢেলে দিতে হয় না, সবটুকু, যা মনে আসে, তাই বলতে হয় না। বিশ্লেষণমূলক সমালোচনা চলে, কথা কাজ ও ব্যবহারের শত খুঁটিনাটি ত্রুটিবিচ্যুতির;—একে প্রমাণ করে অপরের স্বার্থপরতা, ঔদাসীন্য, অবিবেচনা, আলস্য, অপটুতা, অকর্ম্মণ্যতা, অন্যায়, অবিচারকে, না-বোঝাকে, স্নেহমমতা ভাল-বাসার অভাবকে। হৃদয়মন টুকরো টুকরো হয়ে যায় দুজনের। জীবনের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষতে রক্ত ঝরতে থাকে।

তমসা কেঁদে থামে। অথবা থেমে কাঁদে।

সৌম্যেন থামে, যে কোন বই তুলে উল্টো সোজা যে ভাবে হোক খুলে মুখের সামনে ধরে গুম হয়ে থাকে।

খানিক পরে একজন কথা কয়,—সহজ স্বাভাবিক সাধারণ কথা। কোন দিন তমসা, কোন দিন সৌম্যেন।

আরম্ভ হওয়ার একমুহূর্ত্ত আগেও যেমন যুদ্ধের ইঙ্গিতটুকুও থাকেনি তাদের কথায় ব্যবহারে, শান্তিও তেমনি সুরু হয় বিনা ভূমিকায়।

হাসি আসে, মাধুর্য্য আসে শান্তিতে। যতটা সম্ভব। টুকিটাকি খিটিমিটির মধ্যে যুদ্ধের জের টেনে চলবার মত অন্ধ একগুঁয়ে তারা নয়, চাপা যখন পড়ল সংঘাত তখন তা চাপা দিয়ে রাখবার মত উদারতা তাদের আছে। ভাল তারা দুজনেই, মন তাদের ছোট নয়, হৃদয় বড় কঠিন। কোমল অনুভূতি, ব্যাপক প্রেমভাব, মৃদুতম স্পর্শে সমবেদনার

সাড়া, আধ্যাত্মিক ত্যাগপ্রেরণা, মার্জ্জিত বিনয় ও নম্রতা, ভদ্রতা, সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধির সমাবেশ ঘটেছে তাদের মধ্যে। তারা কি পারে মিছামিছি পরস্পরকে ব্যথা দিতে ?

তবু হঠাৎ তারা মরিয়া হয়ে পরস্পরকে কুচি কুচি করে কাটে দিনে রাত্রে কয়েকবার,—তিক্ত বিস্বাদ হয়ে যায় জীবন ; দুজনেই ভাবে, এর চেয়ে মরণ ভাল।

দুজনেই ভাবে, কেন এমন হয় ? অনেক স্বপ্ন সফল হয়নি জীবনে, অনেক আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে, অনেক বিশ্বাস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে বাস্তবের আঘাতে—তাই বলে অমন অশান্তি, এমন তিক্ততা কেন দুর্বহ করে তুলবে তাদের জীবনকে ? যা আছে তাও তো একেবারে তুচ্ছ নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়। হাসি ও মাধুর্য্যভরা নিবিড় শান্তির দু'চার ঘণ্টা তো সার্থক করে রাখছে আংশিক জীবনকে—যা আছে, যা পাওয়া গেছে তারই মূল্যে। সমস্ত জীবনটা কেন অর্থহীন হয়ে গেছে ? কেন দিবারাত্রি সুখে দুঃখে হাসিকান্নায় মহাশূন্যে নির্ভর-হীনতার আতঙ্কের মত এই ভয়াবহ শূন্যতাবোধ জেগে থাকছে যে, সব মিছে—এই শেষ ?

মাঝে মাঝে নিজের মনকে জবাব দিয়ে বোঝাবার জন্যই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা ভাবে, জীবনটাই বুঝি এমনি ছেলেখেলার ব্যাপার, বিশ্রী।

প্রতিবিধানের সাধ্যমত চেষ্টা করে।

'সিনেমায় যাবে ?'

'চলো যাই।'

বেশ কাটে কয় ঘণ্টা।

'সনৎ বিশেষ করে যেতে বলেছে কিন্তু।'

'না গিয়ে উপায় আছে ?'

বেশ কাটে কয়েক ঘণ্টা।

'রবিবার ডাকলে হয় না ওদের? নীলাকে পাওয়া যাবে গান গাইতে।'

বেশ কাটে কয়েক ঘণ্টা।

'মোটে বারো দিন ছুটি। তবু চলো, ঘুরে আসি। অনেক দিন বাইরে যাওয়া হয়নি।'

'টাকা?'

'সে হয়ে যাবে।'

বেশ কাটে ন'টা দিন দিদির বাড়ীতে, পাহাড়ে, বনে, ঝর্ণায়। কিন্তু সে তো কতকগুলি ঘণ্টা, কয়েকটা দিন! ঘুষ দিয়ে কি জীবনকে বাগানো যায়!

সুনীল সৌম্যেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মনোবিজ্ঞানে বিদেশী ডিগ্রী নিয়ে এসে দেশী কলেজে ইংরাজী সাহিত্য পড়ায়। সে বলে, 'না, এটা কোন বিশেষ মানসিক রোগের লক্ষণ নয়। কি জানিস, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের এটা বৈশিষ্ট্য। ঝগড়া করে কেঁদে কেটে আদর চায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব মেয়ে এক রকম।'

আদর চায়? আদর? ঝগড়া আর কাঁদাকাটার পর আদর তো তমসা পায় না, চায়ও না। কে জানে! সৌম্যেন ভাবে, কে জানে! ঝগড়ার পর আদর করতে যায় পরদিন তমসাকে।

'এ আবার কি তামাসা?' তমসা বলে তাকে।

পাতলা কাঠির তক্তা গেঁথে, সাদা পেণ্ট মাখিয়ে, দুভাগ-করা দোতলা। ওপাশের বাড়ীতে নির্ম্মল দস্তিদার থাকে। সৌমেন্তের সমবয়সী, বিদ্যা মাত্র দু'বার বি এ ফেলের, চাকরী অনেক নীচুস্তরের সৌম্যেনের চাকরীর তুলনায়, আয়টা সামান্য কিছু বেশী উপরি নিয়ে। স্ত্রীর নাম নলিনী, বয়সে দু'তিন বছরের ছোট হবে তমসার। রূপসী বেশীই হবে সব হিসেবে। আশ্চর্য্য এই, ছেলে আর মেয়ে—দুটি দুজনের প্রায় এক-বয়সী।

মাটির মাশুল

নলিনী বলে, আপনি যদি মুখ্যু হতেন দিদি আমার মত, সই পাতাতাম আপনার সাথে।

নির্ম্মল অতটা সরল নয়। সৌম্যেনের দাম্পত্য ব্যাপার নিয়ে সোজাসুজি উপদেশ ঝাড়বার সাহসও তার হয় না। ঈশপের মত গল্পছলে সে দাওয়াই বাৎলে দেয়। একবার নয়, অনেকবার। যে কোন প্রসঙ্গে গল্পটা টেনে আনতেও অসুবিধা হয় না, বিজ্ঞাপন-লেখকদের মত এবিষেয়ে সে নিরঙ্কুশ একস্‌পার্ট।

'বলছেন তো দিন আরেক কাপ। ওতে আর কি। দুচার কাপ বেশী চা খাওয়া অভ্যাসও হয়ে গেছে আজকাল।...সুন্দর চা করেন আপনার স্ত্রী, ভাগ্যবান মশায় আপনি...আগে ছিল না। আগে—মানে ওই বেশী চা খাবার অভ্যাসের কথা বলছি। সকালে এক কাপ, বিকালে এক কাপ বাঁধা। এক কাপ যদি বেশী চেয়েছি কোনদিন, সর্দ্দি টর্দ্দি হলে পর্য্যন্ত—সেকি কাণ্ড মশাই, একেবারে যেন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মারতে উঠতেন। সে রণচণ্ডী মূর্ত্তি তো দ্যাখেননি দাদা। আর শুধু কি চা এক কাপ বেশী চাইলে? ও লেগেই আছে উঠতে বসতে, পান থেকে চুণটি খসবার যো ছিল না, দেয়াল ফাটিয়ে দিত চেঁচিয়ে।'

চায়ে চুমুক দেবার আরাম ভোগ করে নিয়ে তারপর সে শিউরে ওঠে অতীতের স্মৃতিতে, 'বাপ্‌স! কি দিন গেছে!' তারপর সে গম্ভীর হয়। সৌম্যেন জানে, গম্ভীর হয়ে এবার সে কি বলবে। তবু সে আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করে, অনেকবার-বলা কথাটা এবার সে কি বলে শুনবার জন্য। 'দোষ ছিল আমারি। বোঝার দোষ। জীবনটাতো ছিনিমিনি খেলা নয়, আপনিই বলুন দাদা? আনো, খাও, সুখ কর, তাকে কি সংসার বলে? মানুষের আত্মা আছে, তার তো

একটা অবলম্বন চাই? নইলে শুধু খেয়ে দেয়ে ফুর্ত্তি করার জন্ম সংসার হলে কি সুখ শান্তি থাকে সে সংসারে? মনটা বিগড়ে গেল একেবারে, ভাবলাম সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব। ভাবতে ভাবতে ধর্ম্মে কেমন মতি হল একটু, বাড়ীতেই অল্পবিস্তর চর্চ্চা সুরু করলাম। সামান্ত পুজো আচ্চা জপ-তপ, সংসারে কি বলে গিয়ে তাই যথেষ্ট। বলব কি আপনাকে, সংসারের চেহারা যেন আমার বদলে গেল দুদিনে। জরি শিকড় ছোঁয়ালে সাপ যেমন মিইয়ে যায়, উনি ঠিক তেমনি ঠাণ্ডা ভালমানুষ হয়ে গেলেন। সত্যি কথা দাদা, কুঁদুলে মেয়েমানুষ হল সাপের মত, ধম্মো কম্মো ছাড়া তাদের বশ করার উপায় নেই। এখন দেখুন না, দশ কাপ চা চাইলে বানিয়ে দেবে ঠিক, কথাটি কইবে না।'

সৌম্যেন তমসার কাছে গিয়ে বলে, 'ধর্ম্মে তো আমরা বিশ্বাস করিই, ধর্ম্মের কর্ত্তারা যাই বলুন আমাদের একেলেদের সম্বন্ধে। ধর্ম্ম কর্ম্মে আমাদের অবিশ্বাস নেই, কি করে ধর্ম্মকর্ম্ম করব তাই জানিনে বলে মুস্কিল।'

'কিন্তু আজ ধর্ম্মের কথা কেন? সন্ন্যাসী হবে নাকি?' তমসা জিজ্ঞাসা করে।

'ইচ্ছা হয়।'

'তা হবে না? চাকরী করা সংসার করার কত কষ্ট!'

দুজনের বেধে যায়, কুচি কুচি করে কাটে তারা পরস্পরকে। কাঠের দেয়ালের ফাঁক ফোকর দিয়ে ঘরে সঞ্চারিত হয় ধূপের মৃদু গন্ধ। নলিনী ফুল জল দিচ্ছে পটের দেবতাকে, স্নান করে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে।

নির্ম্মলের পাঁচ বছরের মেয়ে মণি প্রসাদ এনে দিয়ে তাদের খামায়। কয়েকটি বাতাসা, কয়েক টুকরো শশা ও কয়েক কোয়া কমলা। ছোট

রেকাবিটিতে ছিটেফোঁটা চন্দনের গন্ধ। দুজনে তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকয়।

নির্মলদের সঙ্গে আত্মীয়তার যে অনুভূতি গড়ে উঠছিল সেটা আবার নতুন করে স্পষ্ট অনুভব করে দুজনেই। সেই সঙ্গে নিজেদের মনে হয় বড় নিরুপায়।

পাতলা কাঠের পার্টিশন। একটা ফাঁকের কাছে এসে নলিনী বলে, 'একটা কথা শুনবেন দিদি? পূজোআচ্চা ধম্মে কম্মে একটু মন দিন। আপনি মন দিলে, ওনারও মন আসবে। দু'জনে শান্তি পাবেন। আমাদের লাগতো না আগে? চুলোচুলি কাণ্ড হত না? পট আনিয়ে নিত্যি পূজো করি—পূজো মানে ওই দুটো ফুল আর জল দেয়া আর কি। চান টান করে শুদ্ধ হয়ে মনটা ঠিক করে নিযে কোনদিন ওঁনাকে দিযে করাই। আর ছোটখাটো নিয়মনীতি পালন করি। উনি যেন বদলে গেছেন, একেবারে নতুন মানুষ। রাগারাগি করেন না বললে হয়।'

বলে সে সরল ভাবেই, হৃদ্যতার সঙ্গে। তবু একটু ঈর্ষা ও ব্যঙ্গের ভাব উঁকি মারে অন্তরাল থেকে। বসে গল্প করে সুখদুঃখের, মোটা গয়নার মত মোটা সুখের, মাটিতে চেপে বসার মত মোটা দুঃখের। জ্বালাতন পোড়াতন হয়ে গেল সে সংসারে। বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই, আরাম নেই, শান্তি নেই। তবে মেযেমানুষের আর কি চাই। এতেই মেয়েমানুষ ধন্য। স্বামীপুত্র রেখে যেতে পারলেই হয।

'জ্বালাতন পোড়াতন কিসে হলেন তবে?'

'ওমা! সামলাতে হয় না সব? আপনি হন না? অত লাগেন কেন কত্তার সঙ্গে তবে?'

মাটির মাশুল

নির্ম্মলেরাও ছুটিতে বেড়াতে যায়। দেশের বাড়ীতে যুদ্ধের কবছরও নিয়মিত গিয়েছে, এবারও যাবে। তার দেশের পথে এক ট্রেণে একই দিনে দূরবর্ত্তী স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্দেশে সৌম্যেনেরা রওনা হবে শুনে নির্ম্মল দারুণ খুসী আর উৎসাহিত হয়ে উঠল।

'আপনাদের নামতে হবে, তুটো দিন থেকে যেতে হবে আমাদের বাড়ীতে। কোন হাঙ্গামা নেই, ষ্টেশনে নামবেন, আবার ষ্টেশন থেকে গাড়ীতে উঠবেন। তুটো দিন শুধু কষ্ট করবেন।'

বাড়ীতে তার গাই বিইয়েছে। ক'মাস খাঁটি তুধ খাওয়াবে। যুদ্ধ শেষ হলেও দেশের অবস্থা খারাপ বটে, তাই বলে টাটকা মাছ তরকারী কি আর অতিথিকে সে খাওয়াতে পারবে না অল্পবিস্তর তুটো দিন। ষ্টেশন থেকে মোটে চার মাইল, ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। কোন কষ্ট হবে না। ষ্টেশন-মাষ্টার আবার নির্ম্মলের নিজের বোনাই। দরকার হলে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখবে আধ-ঘণ্টা, ভিড় হলে শোবার যায়গা করে দেবে। এ সুযোগে দেশের বাড়ীতে পায়ের ধুলো একবার না দিলে সৌম্যেনদের সে ছাড়বে না।

ওদের এত উৎসাহের মানে ভাল বোঝে না, কিন্তু তাদের তুদিন অতিথি পাবার জন্ম ওদের আগ্রহ প্রায় মুগ্ধ করে দেয় সৌম্যেন আর তমসাকে। ট্রেণে খানিকটা মানে বোঝা যায়।

'সদরের ম্যাজিষ্ট্রেট মুখার্জি সায়েবকে তো আপনি চেনেন?' নির্ম্মল বলে কথায় কথায়।

'জানা শোনা ছিল।'

'কাল আসবেন আমাদের গাঁয়ের স্কুল দেখতে। দেখা হবে আপনার সঙ্গে।' নির্ম্মল বলে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে।

মাটির মাশুল

'ওর কাছে আপনার কি কোন দরকার— ?' সৌম্যেন বলে, ফাঁদের সন্দেহে বিব্রত হয়ে।

'আরে রাম রাম।' সোজা হযে উঠে বসে নির্ম্মল। 'ওসব ভাববেন না। সভাটভা হবে, উনি আসবেন, দেখাসাক্ষাৎ হবে আপনার সঙ্গে, তাই বলছি। আমি কমিটিতে আছি কিনা। স্কুলের গ্র্যাণ্টটা কিছু বাড়াতে অনুরোধ করা হবে।'

মানে খানিকটা বোঝা গেলেও তাতে নিমন্ত্রণের আন্তরিকতায় খুব বেশী সন্দেহ হয না। ছাঁচে ঢালাই মানুষ নির্ম্মল, কিন্তু লোক খারাপ নয।

ভোরে তারা নামে। স্থানটি ছোট, তার তুলনায ষ্টেশনটি সত্যই খুব বড়। নির্ম্মলের নিজের বোনাই ষ্টেশন-মাষ্টারটিকে খোঁজাখুঁজি করেও না পাওযায নির্ম্মল রীতিমত ক্ষুব্ধ ও উত্তপ্ত হযে ওঠে। তার এ অপমানে যেন খুসী হযেই নলিনী বলে, 'তোমারি তো বোনাই!'

ষ্টেশন থেকে লাইনের পাশাপাশি বাঁধানো লাল রাস্তা গেছে অনেক দূর, রোগা ঘোড়া দুটি টকর টকর করে গাড়ী টেনে চলে। সকালের শান্ত রোদে এদিকে রেলের লাইন আর ওদিকে ক্ষেত মাঠ, ছাড়া ছাড়া ঘরবাড়ী ও অস্থায়া খড়ের ছাউনি দেখতে বেশ ভাল লাগে। সামনে কিছু দূরে চোখ পড়ে কারখানার উচু চোঙ্গা।

'আমাদের গাঁয়ের জমিদার রামপ্রাণ চৌধুরী, তার মিল। মিলে কি সব হাঙ্গামা চলছে শুনছিলাম!'

পথ দক্ষিণে বেঁকে গেছে মিলের গেটের সামনে দিয়ে। কাছাকাছি গিয়ে তাদের ঘোড়ার গাড়ীকে থামাতে হয়। মিলের গেটের দিকে মুখ করে পাশাপাশি রাস্তা বন্ধ করে আছে একটা লরী, থেকে থেকে গর্জ্জন করে উঠছে ইঞ্জিন, কিন্তু এগোতে পারছে না! লরীর সামনে থেকে

গেট পর্য্যন্ত গাদাগাদি করে শুয়ে আছে মানুষ। পুরুষ ও নারী। চারিদিকে ভিড় করে আছে আরও অনেক লোক।

নির্ম্মল দেখিয়ে দিল, 'উনি চৌধুরী মশায়।'

খদ্দরের কোট গাযে মোটা ভুঁড়িওলা মানুষটি, হাতে দামী কাঠের মোটা লাঠি। দুপাশে ও পিছনে তার সাঙ্গোপাঙ্গের সঙ্গে ডজন খানেক পুলিশ। থেকে থেকে চৌধুরী গর্জ্জন করছে: 'চালাও চালাও উপরসে চালাও। চাপা দে দেও শালা লোককো!'

লরীর ইঞ্জিন গর্জ্জন করে উঠছে। লরীর একহাত সামনের শায়িত মানুষ একটু নড়ছে না। ইঞ্জিনের গর্জ্জন কমে যাচ্ছে। গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে সৌম্যেন আব তমসা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। তমসার ছোট ছেলেটা কাঁদে, নলিনী তাকে থামাতে চেষ্টা করে, তমসার খেযালও থাকে না। তখন হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটে অবস্থার। ইঞ্জিন একেবারে থামিযে দিযে লরীর ড্রাইভার নীচে নেমে আসে।

'নামলি যে হারামজাদা?' রামপ্রাণ গর্জ্জে ওঠে।

'আমি পারব না। আপনি চালান।'

রামপ্রাণের প্রাণে বোধ হয় আর সয় না। অকথ্য একটা কথা বলে সে হাতের লাঠি বসিযে দেয় লরী-চালকের মাথায়। সে ঘুরে পড়ে গেলে তাব দিকে এক নজর না তাকিযেই এগিযে গিয়ে রামপ্রাণ আপালি পাথালি পিটতে থাকে শাযিত পুরুষ ও মেযেদের।

তমসার মাথাটা বোধ হয বিগড়ে যায দেখে। মুখে চেঁচায 'একি! একি!' কাজ করে আরও অদ্ভুত। ঘোড়ার গাড়ীর দরজা খুলে তড়াক করে নেমে ছুটে গিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রামপ্রাণের মোটা শরীরটা।

'কি করছেন আপনি?'

মাটির মাশুল

নিজেকে মুক্ত করে রামপ্রাণ বলে, 'তুমিই বুঝি সরোজিনী ?'

'না। আপনি মানুষ না পশু ?'

সৌম্যেন লরী-চালকের মাথায় রুমাল চেপে ধরেছিল। সে ডেকে বলে, 'শুনছো ? ছোট সুটকেশে ছেঁড়া কাপড় আছে আমার, খানিকটা ন্যাকড়া ছিঁড়ে আনো তো।'

বিকালে স্কুলের সভায় সৌম্যেনের যাওয়া হয় না। রামপ্রাণ চৌধুরীর মিলের অদূরে প্রতিবাদ সভা হবে, গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোক সেখানে ছোটে। সৌম্যেনও যায়।

বড় ছেলেটাকে নলিনীর কাছে রেখে ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে তমসাও সঙ্গে যায় সৌম্যেনের।

শ্রান্ত ক্লান্ত হযে বাড়ী ফিরেও তারা রাত জেগে কথা বলে। পরের বাড়ীর নতুন আবেষ্টনীতে যেন নতুন করে তাদের বিয়ে হযেছে। সুখদুঃখের কথাই বলে। নিজের নিজের নয়, অনেকের সুখদুঃখের কথা।

দেবতা

পদস্থ ও বয়স্ক ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন ব্রজদুর্লভ বাবু। চেহারাটা ছিল জমকাল। চ্যাপ্‌টা ধরণের নয় গোলাকার। সম্ভবতঃ সেইজন্যই মেরুদণ্ডটা ভদ্রলোকের সব সময় সোজা হয়ে থাকত। মনের জোরের বদলে এই কারণে মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে থাকত বলেই বোধ হয় তার অপরিমেয় তেজ ও সাহস ছিল পাথরের কামানের

মত নম্র। হাকিমী পদগৌরব আর কীর্ত্তনের আসর জমাবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছাড়া কোন বিষয়ে অহঙ্কার করার কিছু না থাকায়, বিনয়ের তার একেবারেই প্রয়োজনীয় ছিল না। তবু পুরুষোচিত বিনয় বজায় রাখবার জন্য পদগৌরবটা ভদ্রলোক প্রকাশ করতেন পাণ্ডিত্যে আর কীর্ত্তনের অসাধারণ ক্ষমতাটা প্রকাশ করতেন কেবল কীর্ত্তনে। পাণ্ডিত্যের বিশেষ অভাব থাকায় মানুষের সভয় শ্রদ্ধাটা তার ভাল রকমই জুটত, কীর্ত্তন গেয়ে মানুষকে ভাবোন্মাদ করে দেবার বিশেষ প্রতিভা থাকায় মানুষের হৃদয়ে তার জন্য বয়ে যেত সানুরাগ ভক্তির বন্যা।

কি যে হয়ে যেতেন তিনি কীর্ত্তনের আসরে! গায়ে দামী মুগার জামা থাকত, তবু দীনহীন কাঙালের মত একবার, শুধু একটিবার, চিরন্তন প্রেমময়ের অফুরন্ত প্রেমের ভাণ্ডার থেকে এক কণা প্রেম ভিক্ষা করতেন, তখন মনে হত এত বড় কাঙাল কি জগতে কেউ আছে! চাকর আসরে তামাক দিতে এসেছে, তার গলা জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদতেন। আধা-অন্তরালবর্ত্তিনী মেয়েদের অনেকের চোখ দিয়ে ভাবাবেগে জল পড়ছে, আনন্দে গদ গদ হয়ে তিনি নাচতেন। নিজের মধুর ও গম্ভীর গলার আওয়াজ একটু ধরে এসেছে, আবেগে গড়াগড়ি দিয়ে তিনি ছটফট করতেন। রাত্রি বেশী হয়ে পড়ায় উপস্থিত ভদ্রলোকের মধ্যে কেউ কেউ উঠি উঠি করছেন, বারকয়েক হুঙ্কার দিয়ে নির্ব্বাক নিস্পন্দ সমাধিমগ্ন হয়ে তিনি পড়ে থাকতেন।

আসর বসত প্রায়ই। সাধারণতঃ শনিবার সন্ধ্যায়, অথবা অন্ততঃ একটা দিনও ছুটি হাতে থাকে এমন কোন দিনে। কীর্ত্তনের শ্রান্তি দূর করবার জন্য ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর কমপক্ষে একটা দিনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম অথবা কমবয়সী (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পক্ষের, ঠিক মনে নেই) স্ত্রীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন পার্থিব প্রেমালাপের প্রয়োজন হত। তবে মোটে একদিনের

ছুটি থাকলে বেশী শ্রান্তি তিনি অর্জ্জন করতেন না, রাত বারোটার আগেই কীর্ত্তন শেষ করে দিতেন। রাত কাবার করতেন লম্বা ছুটির গোড়ায়, মনে হত যে উৎসব উপলক্ষে ছুটি সেই উৎসবই তার মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে।

মফঃস্বলের হতভাগা সহর, সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, ভদ্রলোকের উপযুক্ত·অভদ্র স্ত্রীলোকের পল্লা নেই, গোটা তিন চারেক মুমূর্ষু সমিতি ছাড়া জবরদস্ত সমিতি নেই, জোরালো রাজনৈতিক আন্দোলন নেই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও নেই,—থাকার মধ্যে আছে কেবল একটা ক্লাব আর লাইব্রেরী। ব্রজদুর্ল্লভ বাবুকে পেয়ে সহরটা যেন বর্ত্তে গিয়েছিল। নিজের বাড়ীতে কীর্ত্তনের আসর বসাবার প্রয়োজন ভদ্রলোকের হত না। জীবনের অব্যক্ত অংশের পীড়ন থেকে মুক্তিকামী নরনারীকে উন্মাদনা যোগাতেন তিনি পরের বাড়ী। বাড়ী থেকে তাকে নিয়ে আসবার এবং বাড়ীতে পৌছে দেবার গাড়ী যোগান, আসরের সতরঞ্চি ফরাস আলো এবং দরকার হলে সামিয়ানা ও সখ হলে আসরকে সাজ-সজ্জা দান করা, বাজারে ঢুকবার পথে প্রথম মুদী দোকানটির মালিক রাধাচরণ বসাক নামে যে ব্যক্তিটি খোলকে প্রায় কথা বলাতে পারে তাকে সংগ্রহ করে আনা, সহরের কীর্ত্তন বিশারদ ও কীর্ত্তন রসজ্ঞদের সমবেত করা, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মাঝে মাঝে পান তামাক আর শীতল পানীয়জল সরবরাহ করা, এই সব ব্যবস্থা করে ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর কৃপায় রোমাঞ্চ, শিহরণ আবেগ উন্মাদনা প্রভৃতি লাভ করার জন্ম সহরের অনেকেই উৎসুক হয়ে থাকতেন।

বেশী উৎসুক ছিলেন স্থানীয় রাজা-জমিদার মুরারীমোহন। প্রথম বয়সে নাট্য চর্চ্চার উৎসাহে তিনি একটি স্থায়ী ষ্টেজ নির্ম্মাণ

করেছিলেন। জীবনের অলস অনাড়ম্বর গতিতে অসন্তুষ্ট এই সহরের এই অপ্রধান সহরে ব্রজদুর্ল্লভবাবু সুলভ হওয়ার অনেক আগে ষ্টেজে অভিনয় রজনীর সংখ্যা কমতে কমতে বছরে বার তিনেকে এসে ঠেকেছিল। মাসে চার পাঁচবার ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর কীর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার পর পূজার সময় কেবল একদিন একটি মাত্র ছোট ভক্তিমূলক নাটকের অভিনয় হ'ত। প্রহসন পর্য্যন্ত বাতিল হযে গিযেছিল।

সহরবাসীর সকাতর অনুরোধে কত কষ্টেই যে ব্রজদুর্ল্লভবাবু তিন তিনবার নিজের বদলী রদ করেছিলেন।

ক্যানেলের ধারে ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর বাড়ীখানা ছিল লোভনীয। লাল রঙ করা মাঝারি আকারের সাধারণ দোতালা বাড়ী, রঙের আবরণ ছাড়া কিছুই হযত নতুন ছিল না, শোভার হিসাবে চারিদিকে প্রকৃতিও ছিল রিক্ত, তবু কামুক যুবকের কাছে প্রতিবেশীর অনাদৃতা পত্নীর মত কি আশ্চর্য্য মনোরমই বাড়ীটা ছিল! ক্যানেলের স্রোতহীন স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে প্রকাণ্ড অপরিচ্ছন্ন আম বাগান, যার পিছনে আজও সূর্য্য অস্ত যায়। পূবদিকে খানিক দূরে পাকা রাজপথ, যা থেকে একটা কাঁচা-পাকা পথ এ বাড়ী পর্য্যন্ত এগিযে এসেছে। শাখা পথটির দক্ষিণে প্রকাণ্ড দীঘি, উত্তরে ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠ। দীঘির দক্ষিণে স্কুল। ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর বাড়ীর ছাতে উঠলে দেখা যায় স্কুলেরও ওদিকে অনেকগুলি এলোমেলো ভাবে ছড়ান বাড়ী পার হয়ে রাজপথ মোড় ঘুরে পুলের ওপর দিয়ে ক্যানেল ডিঙিয়ে সহরের আরও জমাটবাঁধা অংশে প্রবেশ করে হারিয়ে গেছে। যদি কারও জীবনে কোনদিন কোন প্রিয়জন নিরুদ্দেশ যাত্রা করে থাকে, ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর বাড়ীর ছাতে

উঠে পুল ডিঙিয়ে রাজপথটির সহরের ঘনীভূত অঞ্চলে ঢুকে নিরুদ্দেশ হবার রকম দেখলে তার মনে হবেই, এও একটা নিরুদ্দেশ হবার পথ।

তিনবার বদলী হবার সম্ভাবনা ঘটলে ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর স্ত্রী, যার নাম সম্ভবতঃ ছিল মাধবী, খোনা গলায় বলেছিলেন, 'ওরে বাবারে গলায় দড়ি দিয়ে মরব নাকি আমি! এই সেদিন এসে গোছগাছ করে বসলাম এখেনে, দুদিন যেতে না যেতে বদলী! যেতে হলে তুমি যাও, আমি যাব না।'

সেটা সম্ভব নয়। তাই কত কষ্টেই যে ব্রজদুর্ল্লভ বাবু তিন তিনবার নিজের বদলী রদ করেছিলেন।

সহজ বিষয়কে কঠিন করার সবচেয়ে সহজ উপায় মাঝে মাঝে ধারাবাহিকতার খানিক খানিক গাপ করে ফেলা! রামকে ইজিচেযারে শুইযে সিগারেট টানাবার পর ইন্দ্রের সভায় আসব পান করালে, দশবছর সময আর রক্তের চাপে রামের মৃত্যুকে যে চুরি করেছে পরম রহস্য-স্রষ্টা বলে সেই চোরের পাযে মানুষ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। নিজের জীবনের ধারাবাহিকতার ছোট বড় অংশ ক্রমাগত পরকে দান করে কবে মানুষেব আজ এই দশা হযেছে। তাই শেষবার বদলী রদ করতে হওযার রাগে সাতদিনের ছুটি নিযে পরপর তিনরাত্রি ভদ্রলোক কীর্ত্তন করেছিলেন।

মাধবীব কীর্ত্তন-শ্রান্ত স্বামীর সেবার তুলনা জগতে আছে কিনা সন্দেহ। স্বামী যেন স্বামী এবং পুত্র এবং পর এবং অতিথি— একাধাবে সব। ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর কীর্ত্তন শুনে সকলের যে রোমাঞ্চ হত, মাধবীর খোনা গলায় একটিমাত্র মধুর সম্ভাষণেই ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর তার চেয়েও গুরুতর রোমাঞ্চ হওয়া অসম্ভব ছিলনা। মানুষ ব্রজদুর্ল্লভ বাবু যেতেন কীর্ত্তনের আসরে, নিজে পাগল হয়ে সকলকে করে

দিতেন পাগল, নিজের অলৌকিক পরিণতির সঞ্চয় নিযে তিনি যখন বাড়ী ফিবতেন মাধবীর পূজা পাবাব জন্য তখন হযে যেতেন দেবতা।

অন্ততঃ আমার যে নিঃশব্দ পূজা নিযে তিনি বাড়ী যেতেন, দেবতা ছাড়া আর কারও তা প্রাপ্য নয।

আসরে যেতাম সকলের আগে। বাড়ীর দিকে পা বাড়াতাম ব্রজদুর্ল্লভ বাবু গাড়ীতে উঠে হেলান দিযে চোখ বুজে বসবার পর গাড়ী যখন চলতে আরম্ভ করত। একবার শেষ.চোখাচোখি হওয়ার সাধ কোনদিন আমার মিটত, কোনদিন মিটত না।

কীর্ত্তন শুনতে শুনতে বুকফাটা বিহ্বলতায যে চোখ দিয়ে আমার জল পড়ত, সবদিন সে চোখেব দিকে তাকিযেও যেতেন না, এমনি নিষ্ঠুর ছিলেন ব্রজদুর্ল্লভ বাবু। স্বাধীন স্বাভাবিক চোখে তখনও আমার চশমা ওঠেনি, চোখের জল ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে না পড়ার তো কোন কারণ ছিল না।

আসরে বড়র মধ্যে আমি ছোট, চুপ করে বসে থাকা ছাড়া সব বিষযেই অনধিকারী। কীর্ত্তন আরম্ভ হলে আমার ভাবান্তর হবে আমি তা জানতাম। তাই প্রথম থেকে হয়ে থাকতাম নির্ব্বাক নিঃশব্দ সুশীল সুবোধ বালক, কেবল ভাবের অভিব্যক্তিতে একটু চঞ্চল। তবু মাঝে মাঝে কেন যে আমাকে শুনতে হত, 'গোলমাল কোরোনা, খোকা', আজও তা বুঝতে পারি না। তবে তাতে আমার ক্ষতি ছিল না। এত বড় হৃদয ছিল তখন যে ব্রজদুর্ল্লভ বাবু যা পরিবেশন করতেন তার সঙ্গে এসব কথা শোনার অভিমানেরও হৃদয়ে স্থান হত।

গুরুজন বলতেন, 'অনেক রাত হযে গেছে, চল এবার বাড়ী যাই।'

ঠোঁট কামড়ে অসম্মতি জানাতাম। ঠোঁট কামড়াতাম কথা বলতে

পারতাম না বলে। গুরুজন শঙ্কামিশ্রিত চিন্তাকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখতেন।

বাড়ী ফেরার পথে শুনতাম, 'লেখাপড়া ফেলে এসব করলেই তোর দিন যাবে?'

কে সে কথার জবাব দেবে? দিন তো চলে গিয়েছে কখন। গাছের আড়ালে ক্ষীণাঙ্গ চাঁদ। পাতা আর ডালের ফাঁকে ফাঁকে আলোর বিন্যাসের সঙ্গে ছায়ার যোগাযোগ ঘটিয়ে ইচ্ছামত মৃত্তিকে রূপ দেওয়া যায়।

জিজ্ঞাসা করতাম, 'কেঁদে কেঁদে দেখতে চাইলে দেখা দেন, না? কত কাঁদতে হয়? অনেক? গুরুজন বলতেন, 'চল, জোরে হাঁট্।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে আলোচনা শুনতাম, আমার এই অদ্ভুত পরিবর্তনের সম্বন্ধে। এই বয়সে এরকম পাগলামী আমার অকল্যাণ ঘটাতে পারে ভেবে আমার আপনজনের আশঙ্কায় আমাকে আশ্চর্য্য করে দিত। আমাকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেবার জল্পনা-কল্পনা শুনতে শুনতে ঘুমের ভাণ কখন আসল ঘুমে পরিণত হয়ে যেত, স্বপ্ন দেখতাম আমার জাগ্রত কল্পনার তপ্তকাঞ্চনাভ বিরাট এক পুরুষের অবিভক্ত অস্তিত্বের এবং আমার প্রতিবেশিনী সখি বেণুর সব চেয়ে ছোট পুতুলটির মত শুভ্রকায় বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র এক পুরুষের সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট অস্তিত্বের কি ভাবে দুটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না হওয়া সম্ভব। চারিদিকে অসংখ্য ব্রজদুর্ল্লভ পলকে পলকে মাধবী হয়ে যাচ্ছে অথবা অসংখ্য মাধবী পলকে পলকে ব্রজদুর্ল্লভ হয়ে যাচ্চে, স্বপ্নে এসব ঘোরপ্যাচ আমায় পীড়া দিত না। ধারাবাহিকতার ফাঁদ এড়িয়ে অনায়াসে ভিজা মাঠে ভিজা ফুটবল স্যুট্ করে গোলের দিকে পাঠিয়ে দিতাম, পরক্ষণে নিজে চলে যেতাম উলঙ্গিনী মাধবীর কাছে।

মাটির মাশুল

মাধবীর কাছে যেতাম, সকালে ঘুম ভেঙে নয়, স্কুল পালিয়ে।

দোতালার একটা ঘরের কোলে ছোট একটি কাঠের বেদীতে কোনও একজন দেবতার পট, তার সামনে ছোট দুটি রেকাবিতে ফলমূল বাতাসার নৈবিদ্য সাজিয়ে মাধবী পূজায় বসেছে। বিড় বিড় করে কি মন্ত্র বলছে সেই জানে।

আমাকে দেখেই বলত, 'মহারাজ এসেছেন? আসুন, বসুন।'

কীর্ত্তনের আসরে যার জন্য ব্রজদুর্ল্লভ বাবু পাগল হয়ে যেতেন তাকে পাওয়া যায় কিনা, কি করলে পাওয়া যায়, দিনরাত মনের মধ্যে এই প্রশ্ন গুমরে বেড়াত! ব্রজদুর্ল্লভ বাবুকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেই তাদের বাড়ী যেতাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস হত না। ভাবতাম মাধবীর কাছে প্রশ্নের জবাব জেনে নেব, পূজারতা মাধবীর ফাজলামিতে সে ইচ্ছাও লোপ পেয়ে যেত। ম্লান মুখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পটের অজানা দেবতার মধ্যে আমার কল্পনার মহান সুন্দর প্রেমময় দিব্য পুরুষকে প্রণাম করে নীরবে মাটিতেই বসতাম।

পূজা সাঙ্গ করে মাধবী আমাকে প্রসাদ দিত। দু'হাত পেতে প্রসাদ নিতাম, সসম্ভ্রমে কপালে ঠেকিয়ে মুখে দিতাম। শশার টুকরোটি লাগত তিতো। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদ তো তিতো লাগলে চলবে না। অমৃতের মত মধুর লাগছে মনে করবার চেষ্টা করতে করতে তিতো শশা গিলে ফেলতাম।

মাধবী শশার টুকরোতে কামড় দিয়ে বলত, 'কি তিতো মাগো!'

বলে, খোলা দরজা দিয়ে বারান্দা ডিঙিয়ে শশার টুকরোটি ছুঁড়ে ফেলে দিত উঠানে।

আমি স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম, ভাবতাম, এমন অবহেলার

সঙ্গে এত বড় পাপ সঞ্চয় করবার সাহস সে পেল কোথায়? ঠাকুরের প্রসাদ মুখে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল!

'প্রসাদ ফেলে দিলেন?'

'বড় তিতো। এক একটা শশা এমনি হয়ে যায়।'

একটি দু'টি করে বাতাসা মুখে দিত মাধবী, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকত ক্যানেলের জলের দিকে।

পায়ে পায়ে নীচে নেমে যেতাম অপরাধীর মত, আমার চোখের সামনে প্রসাদ ছুঁড়ে ফেলে মাধবী যে দেবতাকে অপমান করেছে সে দায়িত্ব যেন আমার। উঠানে নেমে দেখতাম, উঠানের একদিকে নর্দ্দমার কাছে যেখানে আবর্জ্জনা জমা করা হয় সেইখানে মাধবীর চিবান শশাটুকু পড়ে আছে। হাতখানেক তফাতে একটা কেন্নু হেঁটে চলেছিল মৃদু মন্থর গতি। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বাখা নর্দ্দমা সাফ করার ঝাঁটাটি ক্ষযে ক্ষযে অর্দ্ধেকের চেয়েও কমে গেছে। এত ঝাঁটান সত্ত্বেও সেখান থেকে কিন্তু শেওলা লোপ পায় নি। সেদিন সকালেই হযত সেখানটা সাফ করা হযেছিল, তারপর হয়ত কেটেছিল মোটে কযেকটি ঘণ্টা সময, তারই মধ্যে এই ছোটখাট সংসারটির কত নোংরামিই যে সেখানে জমেছে! বুকে বল সঞ্চয করবার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার দেবতার ঈঙ্গিত খুঁজেছিলাম, চারিদিকে তাকিযে একবার দেখেছিলাম মানুষ আমাকে দেখেছে কিনা, তারপর পানের পিক থেকে তুলে নিয়েছিলাম সেই চিবান শশা। মাধবীর হযে মনে মনে বলেছিলাম, 'অপরাধ নিও না'। কপালে ঠেকিযে শশাটুকু মুখে দিযে গিলে ফেলেছিলাম।

বমি আসছিল একথা সত্য, কিন্তু মনের জোরে বমি ঠেকান কঠিন নয়।

নব আলপনা

শ্রীমতী ছিপছিপে কিন্তু কী সুকোমল। রোগা থেকেছে তবু চর্বি জমিয়েছে। দেহ চর্চ্চার বিশেষ প্রতিভায় এটা সম্ভব। খাদ্য কন্ট্রোলের বিশেষ কায়দায় না মুটিয়েও মেদবহুলতার স্নিগ্ধ লাবণ্য ধরে রাখা যায়। কাজটা কঠিন, কঠোর সাধনাসাপেক্ষ হলেও, থিয়োরিটা সোজা। যে মোটায় তার শরীরে শুধু চর্ব্বিই গাদা হয় না, হাড়মাংসও বাড়ে। সুতরাং হাড় সরু রেখে মাংস কম বাড়িয়ে কিঞ্চিৎ চর্ব্বির সমাবেশ ঘটিয়ে একটা সামঞ্জস্য সাধন করতে পারলে রোগা ছিপছিপে থেকেও সিঁটকে যাবার দরকার পড়ে না, শুকনো দেখাবার কারণ ঘটে না। স্নিগ্ধ মোলায়েম লাবণ্য বজায় থাকে।

তবে, ঠিকমত খাদ্য চাই, বাছা বাছা বিশেষ খাদ্য, যা ঠিক ঠিক সময় মত ঠিক ঠিক পরিমাণ মত খেলে হাড় মাস চর্ব্বি কোনটাই যে প্রায় শুধু বাড়বে না তা নয়, কমবেও না এবং তিনেরই পরিমাণমত সামঞ্জস্য অক্ষুন্ন থাকবে। নইলে শুধু রোগাই হবে, কর্কশ দেখাবে। অথবা ঠাম হারাবে।

যেমন চুণো আর শ্রীমতীর মেজবৌদি। চলতে ফিরতে ললিতার সর্ব্বাঙ্গে লাবণ্য দোল খায় আর সেই গর্ব্বে ফেটে পড়া ওর চলন কি! মেজদাটা অমার্জ্জিত গুণ্ডা, ওকে নিয়েই আত্মহারা!

চুণো পাড়ার বস্তির মেয়ে। হ্যাঁ, শ্রীমতীদের পাড়াতেও বস্তি আছে, কলকাতা অদ্ভুত সহর। চুণো রোগা, ক্যাংটা। নিছক খেতে না পেয়ে রোগা, ইচ্ছে করে কম খেয়ে নয়। তাই দেহের গঠনের

লাইন যদিও তার অদ্ভুত, শ্রীমতীর লাইনগুলিকেও হার মানাতে পারে, ধুলোমাখা ছিবড়ের মলিন রুক্ষতা সব নষ্ট করে দিয়েছে।

শ্রীমতী এই ভাবে ভাবে, উপোসী বস্তির মেয়ের রূপলাবণ্য নষ্ট হবার দিক থেকে। অবশ্য এজন্য তার আপশোষ কিছু নেই। লাবণ্য দিয়ে ও মেয়েটা করবে কি, কি কাজে লাগাবে!

ওর কোন স্বপ্ন সফল হবে!

চুণোর স্বপ্ন অদ্ভুত, এলোমেলো কিন্তু জমজমাট—ভিড়ের মত জমজমাট, রাস্তার ভিড়, পূজামণ্ডপের ভিড়, মহরমের ভিড়, মেলার ভিড়, শোভাযাত্রার ভিড়। চলে ফেরে জমাট বাঁধে তারই মধ্যে উল্টেপাল্টে ভাঙ্গে গড়ে নড়েচড়ে। গোবর মাটিতে নিকানো মেঝে শুকিয়ে শুকিয়ে এসে যখন ছোট বড় অনেক ভাগ হয়ে যায় শুকনো-ভিজে মেটে রঙের ছোপে, ন্যাতার টানে আঁকা রেখাগুলির সাথে যেন তৈরা হয় সাদা মাটা ছবি, কুঞ্জর ঝাকড়া চুলের নীচে চিবুকটা চ্যাতালো হয়ে মনে হয় যেন চোখ টিপে তাকে তামসা করে ভেংচাচ্ছে—মজা লাগতে লাগতে চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ঘিরে আসে অসংখ্য অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি। কুমোর বাড়ীর পোড়া মাটির পুতুলে আসল মানুষ দেখার অভ্যাস চুণোর। মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া সে স্বপ্ন ভাবতে পারে না।

বাজারের বড় মোড়টার পাশে কয়লার টুকরি সাজিয়ে সে গিরির পাশে তার গা ঘেঁষে বসে, মনটা উৎসুক হয়ে থাকে চশমা পরা বেঁটে বাবুটা কখন এসে দাম না শুধিয়েই থলে বাড়িয়ে বলবে, চার ঝুড়িই ঢেলে দে। কত?

দু'চার আনা বেশী দিয়েই চলে যায়। লোকটা বোকা বজ্জাত; মনটা তার ভিজিয়ে ভিজিয়ে রাখছে, দরকার মত ইসারা করবে।

ভাবছে যে বড় সে ভাল ভাববে বাবুকে, গলে জল হয়ে থাকবে বড়শী ছাড়া আলগা টোপ গিলে গিলেই। ভাবে ভাবুক, মন্দ কি, এখন এলে হয় মুখটাতে আলগা হাসি ফুটিয়ে।

চড়া দাম হয়েছে কয়লার টুকরির, ভারি চড়া। আট ন' আনা টুকরি—ওপরের টুকরিতে টিপি করা তাই দুটি কয়লা বেশী আছে, এক টুকরি যে কিনবে তার ওটা মিলবে না, তলার একটা নিতে হবে। অনেকে কিনতে চায়, দর শুধিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হতাশভাবে, চলে যেতে পারে না শুধু এই জন্য যে ঘরে একটুকরো কয়লা নেই, আজ যদি বা চলে যায় কোনরকমে, কাল ভোরে আঁচ পড়বে না উনানে, ভাত চড়বে না খেয়ে কাজে যাওয়ার।

তাই চলে যেতে পারে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসাব কষে মনে মনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক হিসাব—আট আনার কয়লায় যে দু'বেলার বেশী তিনবেলা চলবে না! আবার, কয়লা ছাড়া যে ভাত সিদ্ধ হবে না। কি করা যায়?

আড়তদার নন্দীবাবু বলেছে: লেবে লেবে, আট আনা কি বার আনা দিয়ে লেবে! কয়লা নেই সহরে। রাঁধবে না খাবে না লোকে? গলিতে ঢুকে বাঁয়ে দরজা বন্ধ আড়ত। পিছনের খিড়কি দিয়ে ঘুঁজি পথে টুকরি ভরে আনে তারা, উঠানে বসে চাপ ভেঙে টুকরো করে। ঘুঁজি পথে আনা গোণা দেখা যায়, বাবুরা ছাখে, পুলিশ ছাখে, সবাই ছাখে।

এই অবস্থায় স্বপ্ন দেখা, সামনে টুকরি সাজিয়ে, খেয়াল রেখে কে আসছে ক্রেতা। সামনের ওই খাবারের দোকান, ছুটো দোকান বাদে মুড়ি মুড়কি গুড় বাতাসার দোকান, তার বস্তির ঘর ওই ডানদিকের

ওই ঘরের খিজির মধ্যে, সেখানে কে একলাটি। তার মা ভাই গেছে কাজে অকাজে কেজানে কোথা। কুঞ্জ যদি আসে কাগজের ঠোঙ্গায় তেলে ভাজা চপ আর পাঁপর নিয়ে, নোনতা রুটি—বিস্কুট নিয়ে, বলে যে না কেউ ছাখেনি তাকে! ঘরে ঘরে গাদা মানুষ, দাওয়ায় উঠানে বসে দাঁড়িয়ে চাদ্দিকে মুখ ফেরানো মানুষ—তবু কেউ কেউ ছাখেনি, দেখেছে তবু ছাখেনি কি যেন আবাক রকম ম্যাজিক। এক হাতে ঠোঙ্গাটা তুলে দিতে দিতে আরেক হাতে যদি কুঞ্জ ধরে তাকে, সে যদি বলে, থামো আগে খেয়ে নিই, বড্ড আমায় খিদে—অন্য সব মানুষ দাওয়ার মানুষ উঠোনের মানুষ যদি ভাণ করে যে কেউ আসে নি চুণোর ঘরে, শুধু কুঞ্জ এসেছে খাবার নিয়ে, আহা মেয়েটা খাবার কুঞ্জের দেওয়া খাবার থাক। ভালোমানুষ যদি হয়ে যাই সবাই, গিরির মা, নকুড়ের বৌ, আন্দি, মালতী সতীশ ভূষণেরা, মায়া মমতায় চোখ মুখ কাণ বন্ধ রাখে—

না, চুণোর স্বপ্ন দেখা হয় না ভিড় ছাড়া। কোথায় থাকে কুঞ্জ আর খাবারের ঠোঙ্গা অপ্রাপ্য অসম্ভব নিরালা অবসরের সঙ্গে, চেঁচামেচি বকাবকি মারপিট স্নুরু হয়ে যায় তার জাগ্রতে স্বপ্নে—সারা শরীরটা মেলে ধরে সবার চোখের সামনে স্নান পর্য্যন্ত যাকে করতে হয় ঠেলাঠেলি অবজ্ঞা করে, সে ভাববে কি করে নিভৃত অন্তরালের কথা, যা নিরাপদ, দু'দণ্ড টেঁকসই।

তবে তাতেই কি আর ভাঙ্গে চুণোর স্বপ্ন। ওর মধ্যেই তার কল্পনা, ওর সঙ্গেই জড়ানো, ওই কঠোর নিষ্করুণ হাটবাজারি শাসন গালাগাল হট্টগোলে। বরঞ্চ সত্যি সত্যি ওইখানেই যেন আসল স্বপ্ন স্নুরু। কুঞ্জ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে, কুঞ্জ দাঁতে দাঁত ঘষছে রাগে দিশে হারিয়ে, ভাইকে ঠেলে দিয়েছে উঠোনের নর্দ্দমায়, এক

ধাক্কায় লুটিয়ে দিয়েছে যাকে। চকচকে ছোরা বার করে কুঞ্জ বলছে, আয় শালা, আয় শালী, কে আসবি আয়!

চুণো হাত ধরেছে কুঞ্জর, চকচকে ছোরা ধরা হাতটা, সামলাবার চেষ্টা করছে কুঞ্জকে!

উঃ! যদি হত!

নটুক যখন গাড়ী চাপা পড়ল সরকারী রেশনশপের সামনে, গুরুভার গাড়ীটা তরুণ বটগাছটার তলায় খোলাঘরের মত দু'হাত উঁচু মন্দির চুরমার করে শিবলিঙ্গ ভেঙ্গে নর্দ্দামায় ছিটকে ফেলে দুশো গজ দূরে সামনে মানুষের বাধা পেয়ে বাঁয়ে মসজিদের রেলিং ভেঙ্গে থামল আর জ্বলে উঠল, আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা। ভিড় বলা যায় না মানুষের বাধাকে, পঁচিশ ত্রিশজনের বেশী ছিল না।

তাকেই দুর্ভেদ্য বলে মেনে নিয়ে না থামলে অনায়াসে বাধা ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে যেতে পারত গাড়ীটা, পরে কি হত সে পরের কথা। গাড়ী আপনি চলে না, মানুষ চালায় বলেই বুঝি থামতে হয় উর্দ্দিহীন সার্টহীন আধ ন্যাংটো কিছু মানুষের পাতলা দেয়ালে। তারাই আগুন দেয় গাড়ীতে, ধরে নামায় ইউনিফর্ম পরা সাদা মার্কিণী চালক আর উর্দ্দিপরা তার কালো সহকারী আব্বাস খাঁকে।

আব্বাস খাঁ নীরবে বিনা প্রতিবাদে নিজেকে সঁপে দেয়, চোখের পলকে মাথার টুপি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ছোট্ট জনতার পায়ের নীচে। ভয়ে দিশে হারিয়ে মার্শাল উগ্র মার্কিণী স্ল্যাং আউড়ে ভড়কে দেবার চেষ্টা করে ভীরু নেটিভগুলোকে। লাঠী ডাণ্ডা ইঁট পাটকেলের বদলে বড় একটা কয়লার চাপ তার মাথাটা একটু ছেঁচে লটপটিয়ে দেয় কাঁধে।

মাটির মাশুল

একটু এগিয়ে রাস্তার বাঁয়ে তেতালা বাড়ীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে (তেতালা ও একতালা মোটা ভাড়ায় আজকালের মধ্যে বেদখল হয়েছে শ্রীমতীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও) শ্রীমতী এ দৃশ্য ভাখে, ঘটনার প্রায় গা-ঘেঁষা ডাইনেব গলিপথটায় কণ্ঠায় বসানো ডাস্টবিনের ধারে হোটেলখানার ছাইগা ঘেঁটে পোড়া কয়লা খোঁজা বন্ধ রেখে চুণো ভাখে সামনে, সমান্তরালে।

উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপে শ্রীমতী, রেলিঙের ডগায় মেহগনি কাঠের কঠোরতা যেন অত্যাচার করে কোমল হাতের তালুতে. এত জোরে সে আঁকড়ে ধরে রেলিংটা। চুণো শুধু চেয়ে থাকে বিস্ফারিত চোখে।

হোটেলখানায় লাইন লাইন সাজানো শিককাবাব, পাশে রুটির স্তূপ, একটা ছোকরা পেঁয়াজ কেটে কুঁচো করে জমিয়েছে মাটিতে, মাংসের গরম ডেকচি থেকে উঠছে বাষ্প। হৈ চৈ হাঙ্গামা সুরু হয়েছে, খাবলা মারা যায় না মাংস রুটিতে ?

নটুক চুণোর ভাই। মায়ের পেটের ভাই, তবে এক বাপের ব্যাটা কিনা তা নিয়ে ঘোঁট আছে বস্তিতে। নটুক ফর্সা, প্রায় সায়েব বাচ্চার মত সাদা। আঁতুরে তাকে আস্তে আছাড় দিয়ে প্রথম কাঁদন কাঁদাতে কি ঘেন্না জন্মেছিল তুলুর পিসীর যে সে এক আছাড়ে একটা পা ভেঙ্গে বেঁকিয়ে দিয়েছিল নটকুর। আরেক আছাড়ে কি হত কে জানে। বিয়োনোয় ব্যথা বেদনা মূর্চ্ছনা এড়িয়ে নটুকের মা সেঁক তাপের আগুণের মালসাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল পিসীর গায়ে।

জন্ম কাঁদনের আছাড়ে খোঁড়া না হলে হয় তো গাড়ী চাপা পড়ত না নটুক।

চুণো বড় ভালবেসেছিল ভাইটাকে, রাঙা সুন্দর ভাই তাতে খোঁড়া,

অসহায়। যে চাপা পড়েছে সে তার ভাই চুণো এটা টের পেতে পেতে মিলিটারী এসে গেছে। মার্শালেরই একদল জাত ভাই, দীর্ঘ উদ্ধত।

তকতকে পোষাক, চকচকে বুট, বেঁটে বেঁটে বন্দুক। সঙ্গে কয়েক লরী গুর্খা। দেখতে দেখতে দোকান পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আগেই দুয়ারে দুয়ারে আগল পড়েছিল, রাস্তাও সাফ হয়ে যাচ্ছিল, মিলিটারী আবির্ভাবের পর—সামরিক শক্তির প্রতি, বজ্রধারীদের প্রতি নিরস্ত্র ক্ষুব্ধ মানুষের কতবড় সম্মান দেখানো!

শিবমন্দির চূর্ণ করা, মসজিদের দেওয়াল ভাঙ্গা কেউ ধরেনি, অকারণে একটা জীবননাশের বিনিময়ে শুধু অজ্ঞান করেছে হত্যাকারীকে আর পুড়িয়েছে গাড়ী—তাদেরই দেশের সম্পত্তি। শুধু এইটুকু, সামান্য বচসায় হাতাহাতি থেকে ঘরে আগুণ লাগে, তার তুলনায় সাধারণ তুচ্ছ ব্যাপার। তবু সকলে তাদের পথ ছেড়ে চলাফেরার অধিকার খর্ব করে স্বেচ্ছায় মিলিটারীকে সম্মান দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতেই চেষ্টা করেছে। কেন যে এই অনুকূল সম্বর্দ্ধনায়, এই প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভক্তিশ্রদ্ধা জ্ঞাপনে মন ওঠে না সৈন্যের! পলায়নপরদের নিয়েই তাণ্ডব সৃষ্টি না করে, ফট্ ফট্ গুলি ছেড়ে কয়েকজনকে ছিটকে ছিটকে রাস্তায় না শুইয়ে দিয়ে, দোকানে বাড়ীতে দরজা ভেঙ্গে ঢুকে লণ্ডভণ্ড না করে, যাকে সামনে পায় তাকেই আথালি পাথালি না মেরে, সাধ মেটে না! বোধ হয় জানে বলে ওই সম্মান দেখানো টিটকারি, পালানো ব্যঙ্গ? জানে বলে যে রাইফেল ষ্টেনগানধারী তাদের মর্য্যাদাই যদি জানত, সম্মান বোধ থাকত, ট্রাক বোঝাই হয়ে তারা আসবে জেনেও ট্রাক পুড়িয়ে দিত না, ঘাড়ে লুটিয়ে দিত না তাদেরই একজনের মাথাটা? বোঝে বলে যে ছত্রভঙ্গ হয়ে সবার ছুটে পালানো তাদের ভয়ে নয়, যাদের হাত খালি তাদের মধ্যে এত রাইফেল

ট্রেনগান নিয়ে হানা দেবার মধ্যে যে উৎকট তামাসা আছে, হাস্যকর বীভৎসতা আছে, অস্ত্রধারী তাদেরই শোচনীয় ভীরুতা আর আতঙ্কের প্রমাণ আছে, তাই স্পষ্ট করে তোলার জন্য ?

তা এটা চুণোও জানে !

বীরপুরুষরা এইছে, রুক্ষ এলো চুল মাথায় খোপার মত প্যাঁচাতে চেয়ে চুণো বলে মুখ বাঁকিয়ে, মরদরা এয়েছে ! মরে না ব্যাটারা !

বস্তির হিজিবিজি গলিঘুজি দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে সে এগিয়ে যায় ও মোড়ের দিকে, যেখানে রাস্তায় পড়ে আছে টুনকোর ছ্যাচা রক্তাক্ত দেহটা, মলিন পিচে রক্তের দাগ, ছিটকানো রক্তের ফোট ফেট চিহ্ন। আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখতে হয় চুণোকে, তফাৎ থেকে দেখতে হয়, খাঁ খাঁ করছে—রাতের শ্মশানের মত মেঘলা সকালের রাজপথ। ভাঙ্গা শিবলিঙ্গের বটগাছটার তলে শুধু কয়েকজন সৈন্য পরামর্শ করছে। লোহালকড়ের দোকান বুঝি বন্ধ করার সময় পায় নি, তারপর বুঝি আর বন্ধ করতেও দেয় নি, তক্তপোষটা দোকানের সামনের দিকে টেনে এনে তারা বসল।

টিপি টিপি বৃষ্টি নেমেছে।

বাড়ী যা, অন্ধকার ঘরে সন্তর্পণে কানে কানে কুঞ্জ বলে চুণোকে, এরপর যেতে পারবি নে।

চুণো মাথা নাড়ে, কথা কয় না। মোড়ের মাথায় কুঞ্জর গুখো, বিড়ির পাতার ছোট দোকান ঘর, সামনের কপাট বলতে টিনের ঝোলান ঝাপ, ভেতর থেকে টেনে টুনে বন্ধ করেছে। টিনে ফুটো আছে ছোট ছোট, তার একটাতে একটা মোটে চোখ রেখে রাস্তায় শোয়া টুনকোকে দেখা যায়। পাশের এই ঘুপচি জানালাটার পাট একটু ফাঁক

করে তাকালে দুচোখেই পড়ে টুনকো, আরও স্পষ্টভাবে। যদিও তাকাতে হয় চোখ একটু বাঁকিয়ে।

কুঞ্জর ভয়, বন্ধ দোকানের জানালা দিয়ে কেউ চুপি চুপি উঁকি মারছে এটা যদি নজরে পড়ে যায় রাস্তা আর টুনকোর দেহটার পাহারায় রত ওদের। যদি দোকান ভেঙে বা পাশের খিড়কির দুয়ার ভেঙে ভেতরে আসে এমনি না হোক চুণো আর অন্য যে মেয়েছেলে আছে ভিতরের দিকে বাড়ীটার বসবাসের অংশটাতে তাদের গন্ধ পেয়ে। কুত্তার মত ওদের নাক, বাতাসে গন্ধ খোঁজে লুটের যোগ্য মেয়েছেলের।

পিঠে হাত রাখে চুণোর, বলে, দেখে কি করবি? বন্ধ করে দে জান্‌লা। ঘর যা বরং।

চুণো আবার মাথা নাড়ে। তার রুক্ষ চুল আলগা বাঁধন খুলে এলিয়ে পড়েছে।

ঘরের আঁধারেও টের পাওয়া যায় চোখে তার জল নেই, জানালার পাটের ফাঁকটুকু দিয়ে যে আলো আসছে, মেঘলা সকালের ম্লান আলো, তাতে জ্বল জ্বল করছে তার দুটি চোখ।

এ ভারি অন্যায়! ছি!—শ্রীমতী ক্রুদ্ধস্বরে প্রতিবাদ ঘোষণা করে, মিশনের সঙ্গে বৈঠক চলছে ওদিকে, এমন সব কাণ্ড, এমন অত্যাচার।

তারপর সে বলে, যাক গে, মিলিটারী এসে গেছে এবার যাওয়া যাক। চলো যাই।

সে আর তার সঙ্গীকে নিয়ে মোটরটা যখন সামনে দিয়ে যায়, এক মূহুর্তের জন্য টুনকোর দেহটা আড়াল হয়ে যায় চুণোর চোখ থেকে।

ইস্! শ্রী মতী তার সঙ্গীকে বলে টুনকোকে এক পলক দেখে।

ব্রিজ

শ্রাবণের শেষ বেলা।

যে ট্রেনটি ধীরে ধীরে হাওড়া স্টেসনে ঢুকে থেমে দাঁড়িয়ে সশব্দে রুদ্ধ বাষ্প ত্যাগ করল, তার আগমন ভারতের অপর প্রান্ত থেকে। তেরশ' মাইলের বেশী পাড়ি দিয়েছে ঘর্মাক্ত উলঙ্গ কালা মানুষের হাত পাতা লোহার লাইনে চাকা গড়িয়ে।

দশ ঘণ্টার বেশী লেট। এরকম হচ্ছে ছেচল্লিশের অব্যবস্থা, অরাজকতায়। এ ট্রেনটির এত বেশী লেট হবার বিশেষ কারণ ছিল। মাঝপথে মধ্যভারতের বিখ্যাত এক শিল্পকেন্দ্র সহরের স্টেসনে গাড়ীটা অনেকক্ষণ আটকে ছিল।

সে এক কাণ্ড বটে।

সহরে সাদা সৈন্য লাগিয়ে কুলি বিদ্রোহ দমনের হাঙ্গামা চলছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কিছু কিছু সুরু হয়েছিল ওই সঙ্গে। সহরের প্রান্ত-ঘেঁষা স্টেসন, হাঙ্গামার এলাকা থেকে টোঙ্গাতেও প্রায় ঘণ্টা-খানেকের পথ। স্টেসনে গোলমাল ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল ডজন খানেক বিদেশী সৈনিক, নিরিবিলি কিঞ্চিৎ মদ্য পান করছিল—স্ত্রীলোক ছাড়াই। আশেপাশে কাছাকাছি সাধারণ লোক, রেলকর্মচারী আর কুলিমজুরের সপরিবারে বসবাস, রেলওয়ে কোয়ার্টারে, ভাড়াটে বাড়ীতে, বস্তিতে। সুতরাং স্ত্রীলোক কম ছিল না চারিদিকে, রুজি-রোজগারীদের মা বৌ মেয়ে বোন। বিদেশী সাদা সৈনিক, এদেশে মহাপুরুষাধিক। যুদ্ধের সময় রুটির টুকরো দিয়ে তারা দেশী মেয়ে

কিনেছে চিরদুর্ভিক্ষের দেশে, তাদের জন্য গরুছাগল হাঁসমুর্গী রসদ সরবরাহের মত গড়ে উঠেছে উপোসী উচ্ছন্ন গাঁয়ের মেয়ে বৌ সরবরাহের ব্যবসা। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাক, তাদের দাবী তাদের অধিকারের জের তারা টেনে চলতে চায় সমানে। তারা খাবে নিরামিষ মদ আর শত শত উপভোগ্যা স্ত্রী জাতীয় জীব আশেপাশে কালা বাপ ভাই স্বামীর আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবে—এ অসহ্য অন্যায়, নিদারুণ অসঙ্গতি।

অতএব তারা স্ত্রীলোক চেয়েছিল। বেশী নয়, দু'চার জন। একজন হলেও তাদের দশ বার জনের চলে যায়—যুদ্ধের সময় অমন অনেকবার তারা চালিয়ে নিয়েছে। তাদের ট্রেইনিং আছে, ডিসিপ্লিন আছে, মত্ত অবস্থাতেও তারা কিউ দেওয়ার নিয়ম মেনে নিজের নিজের পালার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারে। দুঃখের বিষয় মেয়েটা হয় তো মরে যায়। তা, দেহ যতক্ষণ পচে গলে না যায়, উষ্ণ থাকে। তাজা রক্তে সিক্তিত দেহ। কিন্তু এদিকে ইতিমধ্যে কি যেন হয়েছে মানুষের।

নিরস্ত্র বাপভাই স্বামী-পুত্রগুলি হয়ে উঠেছে দিগ্‌বিদিগজ্ঞানশূন্য গোঁয়ার, সশস্ত্র দেবতাদের পর্যন্ত মেয়েদের গায়ে হাত দিতে দেয় না, বাধা দেয় মরণ পণ করে, মরেও!

গাড়ীটা গিয়ে পড়েছিল স্টেসনের এই মারামারির মধ্যে। গাড়ীর অর্ধেক যাত্রী ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাঙ্গামায়। তারপর যথা নিয়মে চলে গ্যাসবোমা ও গুলি। বেশীর ভাগ আহত যাত্রী গাড়ীতেই এসেছে। কিছু হতাহত পড়ে আছে সেই স্টেসনে অথবা হাসপাতালে।

কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে ট্রেনটির নাগাল ধরেছে। ভোরের দিকের স্টেসন থেকে যাত্রীরা কুড়িয়েছে শুধু গুজব—খানিক বেলার স্টেসনে পাওয়া গিয়েছে খবরের কাগজ।

মাটির মাশুল

জগতে কি শুধু দাঙ্গাহাঙ্গামাই চলছে চারিদিকে? অথবা সেই মধ্যভারতের স্টেসনের হাঙ্গামাই শূন্যে উড়ে এসে ছড়িয়েছে কলকাতায়!

আহত যাত্রীদের উত্তেজনাই সব চেয়ে কম দেখা যায়। এমন ভাবে ক্লিষ্ট হাসি হেসে তারা কথা বলে মাথা নাড়ে যেন বলতে চায়, জগতের অবস্থা যে কি তারাই তো তার জীবন্ত প্রমাণ। ভিড়ের গাদাগাদি আর অনবরত ঝাঁকুনিতে যাদের সবচেয়ে বেশী কষ্ট হবার কথা তাদের সহ্যশক্তি যেন সবচেয়ে বেশী দেখা যায় অভ্যাস আর অভিজ্ঞতার ফলে, একটা হাঙ্গামায় আহত হয়ে যেন এদের সব রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে অবজ্ঞা জন্মে গেছে।

নতুবা সহরের বিবরণ যেমন ভয়ঙ্কর তাতে গাড়ীর কামরায় ভয়ার্ত কলরব সুরু হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু বহুরূপী আতঙ্ক আর কত উত্তেজনা যোগাবে, কত ভীত করবে? একটানা রূপান্তর খেলার সামিল হয়ে গেছে, রোগ দুর্ভিক্ষের নিত্য লীলার মত। অন্তত এ গাড়ীর একজন মাঝবয়সী মানুষ তো আর কোনদিন শঙ্কিত হবে না, স্থায়ী রেখায় কপালের চামড়া ভেঁজে কোনদিন আলোচনা করবে না দুর্দিন নিয়ে। তার দেহযন্ত্রটি বুঝি ট্রেনের সকলের চেয়ে দুর্বল ছিল, শিশু আর বুড়োদের চেয়ে। শুধু ভিড়ের চাপে গরমে আর তৃষ্ণায় বাতাসের ঘাঁটতিতে সে শেষ হয়ে গিয়েছে। মরে গিয়েও পড়ে থাকার স্থান জুটেছে প্রায় লাগেজেরই দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকার মত।

হাওড়ার নতুন ব্রিজ সে আর দেখবে না। তার সাথী ক্লিষ্ট আরক্ত চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ব্রিজটি দেখে মুহূর্তের জন্য তার এসেছিল বিস্মরণ। হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সাথীকে জানালা দিয়ে ব্রিজটি দেখার কথা বলতে গিয়ে যেন

মাটির মাশুল

প্রচণ্ড আঘাতে ঝাঁকি খেয়ে আধ নোয়ানো মাথাটা তার থমকে গিয়েছিল।

ব্রিজ পার হয়ে সহর।

ব্রিজের ঝকঝকে পেণ্ট-মাখা বিরাট কাঠামো থেকে শেষ বেলার পড়ন্ত রোদ ঠিকরে পড়ছে অসংখ্য চোখে।

গুলুর চোখে বিনয়বিহীন শক্ত বিস্ময়। ধুত্তেরি এটা কাণ্ড করেছে কি! কি জন্তে কে জানে বাবা! কত লোক খেটেছে? ইস্, আগে যদি শিখতো লোহা-লক্করের কাজ তো নির্ঘাত এটা তৈরীর কাজে লেগে যেতো চড়া মজুরিতে। চড়া মজুরি দিত কিনা সেটা জানা নাই বটে। দিত না। উঁ হুঁ, দিত না। এতো পুল বটে একটা, হোক যত মস্ত আর অবাক মত, আকাশ ছোঁয়া, আকাশটার মত চকচকে। সান নদীর যে পুল হল সেটাও পুল। বল্টু এঁটে বল্টু এঁটে কি মজুরি মিলেছে? এ শালার পুল বানাতে পয়সা যদি দুটো বেশী মিলতো তো শালার সহরে চড়া দরে ভাত খেতে তা পুষিয়ে যেত। হা, পুল বানিয়েছে ত্থাখো!

ত্থাখো, বিমীর চোখ এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত শানায়, চুড়ি কটা বেচে এলাম, হাবাতেরা রূপো দিয়ে পুল বানিয়েছে ত্থাখো।

অনাথের আনাড়ি চোখ থেকে ব্রিজের ঝলমলে আলোর জোয়ারে রাস্তা মাটি সবুজ বনের ছোপ যেন ধুয়ে মুছে যাবে, ঘুমিয়ে স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না কখনো, রূপকথায় রাজপুরী আর ময়দানবের তৈরী সভা মিলে মিশেও হয়ে থাকে ধানের মরাই ঘেঁষা কোঠাবাড়ি আর ওই ইষ্টিশন। এটা হবে বুঝি বিলেত দেশের সদর গেট, না কি বল? কান্থর মা যে ফিরে গিয়ে গল্প করেছিল কালীঘাটে ধন্না দিতে এসে, সে গল্পের

সদর গেট হবে বুঝি। কত্তাবাড়ীর গেট কতটুকু, তাতে হাতী বাঁধা রয়! আয় বড়কত্তা মেজকত্তা, আয় কত্তাবাড়ীর বেটাছেলে পরীসাজা মাগীরা এয়ে চোখ চেয়ে দেখে যা গেট কাকে বলে।

লক্ষ্মীর চোখে সব-সওয়ার পুরু পর্দা, কিছুই তাতে চমক লাগায় না। মস্ত বড় পুল, চকচকে পুল। মরণ জানে কার কি কাজে লাগে। রাজরাজড়ার সখ হবে বুঝি। হোক গে যাক বাবা, যার সখ সে পুল বানাক, তার সগ্‌গে ওঠার সিঁড়ি তো নয়!

সুদর্শনের অনেকদিনের বিরহী চোখে অনেক সায আর অনেক সমর্থন। হাঁ, একেই বলে ব্রিজ। নির্ঘাত। ইস্পাতের আশ্চর্য অদ্ভুত সংগঠন, সাম্রাজ্যের দ্বিতীয নগরীর উপযোগী তোরণদ্বার। নতুন সভ্যতার জয় ঘোষণা। এতদিনে দেশটা যে একটু এগিয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বেনামী স্পর্ধায় জমকালো এ সৃষ্টি কি প্রখবতর হয়েছে ঝকঝকে সাদা রঙে—সত্যই উদার ক্ষমাশীল এদেশ। এত ক্ষমা ভাল নয়। দেশটা থাকবে ভাঙ্গা বাঁশের সাঁকোয় আটকে, সে দেশের বুকে বিজ্ঞানের এমন আধুনিকতম কীর্তি সৃষ্টি করবে খেয়ালের বশে। চরখার সঙ্গে সাঁকো মানায়, বেশ মানায়। এ ব্রিজ মানায কি? সুদর্শন বার বার সহরে আসে, প্রতিবার ট্রামে বাসে ব্রিজ পার হতে গেলেই সে সমস্ত চাকার শব্দে অবিরাম ধ্বনি শোনে, হায এ দেশ!

সত্যি, এটা কি দেশ? বুকের শিশুটাকে সুদর্শনের হাতে তুলে দিয়ে ব্লাউজের নীচেকার আঁটো জামাটার বোতাম খুলতে খুলতে সুন্দরী জলভরা চোখে ব্রিজের চোখ ঝলসানো রূপকে ঝাপসা করে নিতে থাকে, এ দেশের কিছু হবে না। অমন ব্রিজ বানিয়েছে, এক ফোটা দুধের ব্যবস্থা রাখেনি। মায়েরা যদি সবার সামনে বুক খুলে বাচ্চাকে দুধ দেয়, সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে, এমন ব্রিজের দরকার! ত্যাখনা

বাপু, অমন ব্রিজটা সবাই চেয়ে ত্থাখ না বাপু, সবাই মিলে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন? ব্রিজ দেখে কি চোখ ভরে না—অমন সুন্দর ব্রিজ!

শুধু ট্রাম চলছে? বাব্বা, ভাগ্যে ট্রাম ছিল। সেবারেও সব বন্ধ ছিল, ভাগ্যে ট্রাম চলছিল তাই কোনমতে বাড়ী পৌছুলাম। কাঁধের আঁচলটা কৃষ্ণা কোমরে জড়িয়ে বাঁধে, মুকুলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়। আবার সেই আগের বারের মত ট্রামে যেতে হবে, সহরে দাঙ্গা হাঙ্গামা। সেবার ট্রামে যাওয়া মনে আছে। চারিদিক থেকে সর্বাঙ্গে পুরুষের চাপ কিন্তু কি সুন্দর চওড়া ব্রিজ!

আগেও ব্রিজ ছিল, মুকুল ব্যথিত চোখে চওড়া উঁচু নতুন ব্রিজের উজ্জ্বল স্থবিরতা ত্থাখে।

আগের ব্রিজটার চিহ্নও কি রাখতে নেই? ছিঃ! চোখের ভং'সনায় নতুন ব্রিজের বিরাটত্বকে উড়িয়ে দিতে না পেরে কলেজে ছেলে পড়ানোর ব্যবসায় ক্লান্ত নৃতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার দে মাথা হেঁট করে।

চওড়া ব্রিজ, বুক বেয়ে বিরামহীন মানুষ আর যানবাহনের দুমুখী স্রোত, মাঝখানে ডবল ট্রাম লাইন, দুপ্রান্তে চওড়া ফুটপাথ। চলাচলের নতুন ঐশ্বর্যে এর মধ্যে মানুষ ভুলে গেছে ভারতের সেই অন্যতম দ্রষ্টব্য বিস্ময়—ভাসমান ব্রিজটিকে। দু'দিন আগেও যা ছিল নদী পারাপারের সম্বল। মফঃস্বলের মানুষ হাঁ করে দেখত গঙ্গায় অনড় অচল সেতুটিকে। গাড়ী আস্তে চলতে বলে মিসেস দে তাকাত নদীর দিকে। সত্যই কি নেই সেই বহু পরিচিত কর্দমাক্ত পুরানো পুলটি? সেই পুরানো নোংরা নীচু পুল?

পাশে থাকলে সেদিকে চেয়ে চেয়ে এই ব্রিজ দিয়ে চলা কত সার্থক হত! তাদের নয় সাধ্য ছিল না নতুন জমি কেনার, পুরানো ভাঙা-

চোয়া বাড়ীটা ভেঙে ফেলে নতুন বাড়া তুলতে হয়েছে, একখানা ইটও রাখতে পারে নি ভাঙ্গা বাড়ীটার। এতো গবর্ণমেন্টের ব্যাপার, অভাব কিসের? পাশের দিকে পুরানো পুলটা নয় পড়েই থাকত। যে বোটগুলি বুকে ধরে রাখত পুরানো পুলটি তার দুটি পড়ে আছে পুরানো জঞ্জালের মত নদীব এক প্রান্তে। এমন সমস্যা জাগে! সংশয়!

ওয়াজেদের চোখে ঐতিহাসিক বিস্তার পুরু চশমা, বাইফোকাল। ব্রিজে ঝলসানো আলোয় যেন ধাঁধা লাগায়। পুরানো দিনের জীর্ণ সেতু বাতিল হয়ে গেছে মানুষের মনে উন্নত আধুনিক নতুনকে পেয়ে; ভাবলে বিস্ময় জাগে, গর্বে রোমাঞ্চ হয! পুরানো পিছিযে-পড়া ধর্মোন্মাদ এই দেশ কত সহজে আধুনিকতম সভ্য দেশের মতই মাত্র দুদিনের একটু বিস্ময় বোধ করে কত সহজে কি অনায়াসে গ্রহণ করেছে বিজ্ঞানের রূপধরা বিরাট প্রগতিকে!

বাংলার রাজধানী। বিদেশীর পররাজ্য হোক, তবু তো তার রাজধানী থাকে। ষোল শ' নব্বুই খৃষ্টাব্দে জব চার্ণকের ভিত্তি পতন। হুগলীর ফৌজদার সায়েস্তা খাঁর দাপটে সদলবলে পলাতক জব চার্ণকের কেন যে পছন্দ হয়েছিল তুচ্ছ নগণ্য সুতানটি গ্রামটিকে ইতিহাস তা জানে কিন্তু বলে না। বলে না বোধ হয় দিল্লীর বাদশা ফারুক শাব খাতিরে, জব চার্ণকের পছন্দের ভবিষ্যৎ যার অজানা ছিল। ইতিহাস শুধু জানার ভান করে সতেরশ' চোদ্দ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে ইংরেজ বণিকরা ফারুক শা'র কাছে ত্রিশটি গ্রামের ইজারা প্রার্থনা করে দরখাস্ত দাখিল করেছিল। ব্রিটিশ গ্রাম! ইজারা! দরখাস্ত!

জাহানারার কাজলা চোখে সাদা ব্রিজে ঠিকরাণো পড়ন্ত রোদের চেয়ে ঝলমলো আলো খেলতে পারে।—ছোড় দো তুমারা হিষ্টিরি ঔর লেকচার। হিষ্টিরিযা হোগি।

পিটার রবসনের কটা স্থির চোখে সব আলো সব রক্ত বিয়ারের সাদা ফেণা আর সোনালী স্বচ্ছতা। ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। এ তার কল্পনা, তারই পরিকল্পনা। এদেশের পরম পরিণতির সিম্বল। জানো বিল্লীদাস, হোয়াইট ক্লাবে আমার ঘরের জানালা দিয়ে ব্রিজটা গড়ে উঠতে দেখেছি আর ভেবেছি This is no competition with Tajmabal, it's the fulfilment! জানো ডিয়ার বেটি, এদেশে···

ডিয়ার বেটির পাতলা চোখে শুধু আমেরিকার আকাশেই সূর্য ওঠে আমেরিকান ব্রিজেই আলো ঝলসায়, সে বলে, তুমি যদি ওয়াশিংটনে যেতে—

যাওয়া ভাল, আসা ভাল, তাতে দিল খুশ থাকে। রূপেয়াসে নফা, বাস। হাতে হাত মিলাও, আসল ওই। বিল্লীদাস সত্যসত্যই বেটির মার্কিনী হাতে হাত মেলায়, রবসনের ইংরাজী হাতও বাদ দেয় না। এ ব্রিজ কুছু না। আমেরিকায় প্রোডাকসন কত! প্রোডাকসন চালু রইলে এমন কত ব্রিজ আপনাসে গজাবে।

·

ব্রিজ পারাপারে ভয় নেই, ব্রিজটা নিরাপদ। কিন্তু ব্রিজের এমাথা ওমাথা চলাচল করার তো মানে সে মানে হয় না। পেরিয়ে কোথাও যেতে হবে, এ পারে ওপারে কোথাও যাওয়া আসার জন্ত ব্রিজ। ওপারে সহরটাতে ভয়, বিপদ। তাই এমন মস্ত ঝকঝকে নিরাপদ ব্রিজ থাকতেও হাজার হাজার মানুষ ওপারে না গিয়ে স্টেশন কামড়ে পড়ে আছে. কম্বল সতরঞ্চি বিছিয়ে গাদাগাদি করে। অসংখ্য মুখর কণ্ঠ মিলে আটকানো ঝড়ের আওয়াজ। মিশ্র ভাপ্‌সা একটা দুর্গন্ধ বাতাসকে পর্যন্ত ভারি করেছে। ট্রেণের কামরার সঙ্গে

প্ল্যাটফর্মের, স্টেশন এলাকার কোন পার্থক্য নেই। নবাগত ট্রেণের উগরে দেওয়া যাত্রীরা ঘোলা জলে কাদা জল মেশার মত মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হবে। ব্রিজের ওপারেই ঘরবাড়ী আশ্রয় সংসার জীবন! প্রাণ হাতে করে নিয়ে যাওয়ার খানিক আশা আছে যাদের তাদের অন্তত যেতে হবে। যাদের তাও নেই তারাই পড়ে থাকে।

ঝকঝকে প্রাইভেট গাড়ীগুলি যায় সবার আগে। গাড়ীর পেণ্টে আঁচড়ের দাগ পড়ে নি।

তোমাদের ভয় কি? বিল্লীদাস রবসন বেটিকে অভয় দেয়, একদম দাঙ্গাব মাঝে হেঁটে যাও কেউ কুছু বলবে না। তোমাদের সাথে ঝগড়া কার?

জাহানারার চোখ ঝলসে ওঠে, ছোড়দো তুমারা হিষ্টিরি, উজবুক। ভলাণ্টিয়ারকো পুছো কেইস্যা যানা হ্যায়। তুম কোন হো বাতাও।

ওযাজেদ মাথা নামিয়ে সায় দেয়। তাই ভাল। এই ব্রিজের কোন ঐতিহাসিক মানে হয় না।

কৃষ্ণা বলে, আমায় যদি গাউন পরাতে তবে ঠিক হত, অনেকটা নিশ্চিন্ত হওযা যেত। তুমি একা হলে তোমার সায়েবী পোষাক কাজে লাগত, আমার সঙ্গে দেখে সবাই চিনে ফেলবে না? একটু কায়দা করে কাপড়টা পরে নেব যাতে চেনা না যায় আমি ঠিক—?

মুকুল ক্ষোভের সঙ্গে বলে, মানুষ সত্যি আর মানুষ নেই।

সুন্দরীর কাঁদো কাঁদো গলায় একটু ঝাঁজ এসেছে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে গ্যাকো না বাবু ভলাণ্টিয়ারদের খোঁজ করে? যদি কোন উপায় হয়?

মাটির মাশুল

সুদর্শন মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বলে, কারা সত্যি ভলান্টিয়ার, কারা ডাকাত তাই যদি জানতাম—

অনাথের হাত ধরে টানতে টানতে লক্ষ্মী বলে, আ মর ছোঁড়া, আয় না চট করে। বাবুদের লরী যে বোঝাই হল, জায়গা পাবি নে রে, ছুটে চল। সগ্‌গে যাবার জ্বালা ঢের কম বাপু, তা মোর মরণ নেই।

পোটলাটা ঘাড়ে তুলে শুলু বলে, চ'যাই, পা চালাই।

পুঁটুলিটা বগলে নিয়ে বিমী বলে, চ।

ভয়ঙ্কর

বিশ্বম্ভর গদিতে বসে তামাক টানছে, আশে পাশে প্রসাদ ও অন্যান্য কর্মচারী। তামাক টানতে টানতে বিশ্বম্ভরের কাশি, সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও খক্ খক্ ক'রে কাশ্‌তে আরম্ভ করল। পরে বিশ্বম্ভরের কাশি থেমে গেল কিন্তু প্রসাদের কাশি আর থামে না। তখন—

বিশ্বম্ভর : (ধমকে) প্রসাদ !

প্রসাদ : (কাশি থামাতে পারলে না)

বিশ্ব : (আরও জোরে)প্রসাদ—!

প্রসাদ : (কাশি চাপতে চাপতে) আ-জ্ঞে—!

বিশ্ব : বলি তোমার ব্যাপরটা কি হে প্রসাদ? আমি কাশলে তোমার কাশি পায় কেন?

গজেন : বেয়াদপি বাবা—স্রেফ ছোঁড়ার বেয়াদপি। শুধু কাশলে কেন, তুমি হাস্‌লেও ওর হাসি পায়।—ভগবান না করুন, তুমি যদি কখনো কাঁদো—

বিশ্ব : (উচ্চহাসি) হাঃ—হাঃ—হাঃ—কাঁদ্‌ব কেন মামা!

গজেন : বালাই! কাঁদ্‌বে কেন?

বিশ্ব : তোমার কিন্তু এ ভারী বিশ্রী স্বভাব প্রসাদ। তামাক টান্‌তে গিয়ে আমি দু'বার কাশলুম, তুমিও অমনি কাশতে কাশতে মরবার দাখিল হ'লে।

প্রসাদ : না বাবু, তা নয়—

বিশ্ব : ইস, মুখখান যে টুকটুকে লাল হ যে উঠলো।

গজেন : আর বলো কেন বাবা, ছোঁড়া কথায় কথায় মেয়েলোকের মত লাল্‌চে মেরে যায়। ও যদি মেয়েলোক হোতো—

বিশ্ব : প্রসাদ যদি মেয়েলোক হতো! হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

(উচ্চহাসি, সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদও হাস্‌তে থাকবে। বিশ্বম্ভবেব হাসি থেমে গেলেও প্রসাদের হাসি থামবে না)

বিশ্ব : প্রসাদ!

প্রসাদ : (হাসি চ'লতে থাকবে)

বিশ্ব : (ধম্‌কে) প্রসাদ!

প্রসাদ : (আচম্‌কা হাসি থামিয়ে) আ-জ্ঞে!

বিশ্ব : ফের যদি এ রকম বেয়াদপি ক'রবে প্রসাদ—

প্রসাদ : (কাতর ভাবে) আজ্ঞে বেয়াদপি নয় বাবু।

বিশ্ব : কি তবে ? মাথায় ছিট আছে ?

প্রসাদ : না বাবু।

বিশ্ব : কাঁপছো কেন ? জ্বর আসছে ?

প্রসাদ : আজ্ঞে না তো !

বিশ্ব : তবে ?—মুখখানা কেব দেখছি কাগজের মত সাদাটে বনে গেছে। গাযে কি তোমার রক্ত নেই ?

প্রসাদ : আজ্ঞে—ছেলেবেলা থেকে নানারকম অসুখে ভুগছি—

বিশ্ব : কি অসুখ ? সাত বছর আমার কাছে আছো, তেমন কোনো অসুখ-বিসুখ হতে তো কখনো দেখিনি।

প্রসাদ : আছে বাবু, ভেতরে ভেতরে আছে।

বিশ্ব : ছাই আছে। রোগীব মত রোগা চেহাবা তোমাব নয।

প্রসাদ : কিছু নেই বাবু দেহে। দিনরাত বন্ বন্ ক'রে মাথা ঘোবে, বুক ধড়ফড করে। নিযম মেনে সাবধানে চলি ব'লে কোনো মতে টিকে আছি। একদিন যদি বিষ্টিতে ভিজি, সর্দি কাশি নিম্‌ম্যানিযা হযে মরে যাব।

বিশ্ব : তোমার মরাই ভাল।

গজেন : মরেই তো আছে বাবাজী !

বিশ্ব : যাই হোক, কারখানায় টাকাটা আগে পৌছে দিয়ে মরো-বাঁচো যা খুসী কোরো। আজ মাইনে না দিলে কাল কেউ কাজে আসবে না বলেছে। ব্যাটাদের আস্পদ্দা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আবার আইন দেখায—আমি বিশ্বম্ভর শর্মা, বামুনের ছেলে হ'যে চামড়ার কারখানা খুলেছি, আমায় আইন দেখায়! কোনো ব্যাটাকে আমি

ভরাই !···থাক্‌গে—দেব বলেছি আজকে, তাই পাঠাচ্ছি,—নইলে একবার দেখে নিতাম ব্যাটারা কী করে !—হিসেব ঠিক আছে মামা ?

গজেন : ঠিক আছে বাবাজী ! ন'শো তেইশ টাকা পাঁচ আনা তিন পাই ।

বিশ্ব : কামাই কেটেছো সব ?

গজেন : হ্যাঁ—!

বিশ্ব : আচ্ছা তবে প্রসাদকে হিসেবের কাগজটা দাও । বেলাবেলি চ'লে যাও প্রসাদ । বৈশাখ মাস—ঝড় টড় উঠ্‌তে পারে । আমি ঘরে গিয়ে টাকা বার ক'রে রাখছি ।

প্রসাদ : যে আজ্ঞে ।

বিশ্ব : মামা, তুমিও বেরোও । আড়তে গিয়ে বংশীকে বোলো, রাতের চালানটা যতক্ষণ না আসে আড়তে জেগে ব'সে থাক্‌তে হ'বে, লোকজন নিয়ে । দরকার হ'লে সমস্ত রাত । হ্যাঁ—আরেকটা কাজ কোরো মামা । আস্‌বার সময় দু'টো বোতল নিয়ে এসো ।

গজেন : একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না বাবা ? ক'দিন উপরো-উপ্‌রি একটানা চল্‌ছে—

বিশ্ব : তোমার ভাগ্নে বৌ আজ মাংস র'াধছেন—কোর্মা ! বলেছেন পেট ভরে ভালো ক'রে না খেলে কাল বাপের বাড়ী চ'লে যাবেন । ভদ্দরলোকে শুধু শুধু মাংস খেতে পারে মামা ? প্রসাদকে আজ এক গেলাস খাইযে দেব । ভদ্দরলোকের ছেলে—তিরিশ বছর বয়েস হোলো, একদিন একটু চেখে দেখ্‌লে না বিলিতির স্বাদ ! আজ চাখিয়ে দেব ।

প্রসাদ : না—বাবু—না—!

বিশ্ব : আরে মোলো—এটা মানুষ না বাঁদর ?—যাক্, আমি চল্লাম যেমনটি বলেছি—সেইমত যেন সব কাজ হয় !

(বিশ্বম্ভর চলে গেল)।

গজেন : দেখ্‌লে প্রসাদ ? দেখলে ? আমি ওর মামা, গুরুজন আমার সঙ্গে ব্যাভারটা দেখ্‌লে ? আমি মামা—আমি মদ এনে দেবো—তাই উনি গিলবেন—!

প্রসাদ : বড় তেজী মানুষ !

গজেন : তেজী না তোমার মাথা ! একটা পাষণ্ড—পাঁটি পাষণ্ড ! তবু যদি মাইনে বাড়িয়ে দিত দশটা টাকা। তিনমাস ধ'রে ব'লে ব'লে মুখ ব্যথা হ'য়ে গেল, গেরাহ্যই করে না। বামুনের ছেলে চামড়ার ব্যবসা করলে এম্‌নিই হয়—হাঁড়ি-মুচি ডোমের অধম হ'য়ে যায়।

প্রসাদ : (সভয়ে) আঃ একটু আস্তে আস্তে বলুন—শুন্‌তে পাবেন যে !

গজেন : (চমকে উঠে তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে) পায় পাবে ! ওকে ডরাই আমি ? কি করবে আমার ? তাড়িয়ে দেবে ? দিক্—তাড়িয়েই দিক্। মামা হ'য়ে ভাগ্নের দাসত্ব—ছোঃ !

প্রসাদ : আমার বাকী মাইনের কি হবে মামাবাবু ?

গজেন : ছাই হ'বে—কচুপোড়া হ'বে ! আজ না মাইনের কথা বল্‌বেই ঠিক করেছিলে ? কই, এতক্ষণ ধরে এতো কথা হোলো বলতে পারলে না বাকী মাইনের কথাটা ?

প্রসাদ : সাহস হোলোনা। মেজাজটা যেন কেমন কেমন—

গজেন : হুঁ :—তবে আর তুমি বলেছ। এর চেয়ে ভাল মেজাজ ও-গুণ্ডাটার কস্মিনকালেও দেখতে পাবে ভরসা কোরোনা। মরুকগে

বাবা—আমার কি ?—বাই আড়ত হ'য়ে বোতল দু'টো নিয়ে আসি—যত সব ইয়ে—

(শেষের কথাগুলি বলতে বলতে যাবে)

প্রসাদ : বাবুকে কেউ গাল দিলে শুন্‌তে ভালই লাগে, আবার কেমন বিশ্রী একটা অস্বস্তিও বোধ করি। গা কাঁপতে থাকে।

ফুলি : (নিকটে এসে) কাঁপবে না ? গা তোমার সারাক্ষণ কাঁপবে ! পুরুষ মানুষ তো তুমি !

প্রসাদ : ওঃ—ফুলি ! আচমকা তোমায় দেখে চম্‌কে গেছি—

ফুলি : চম্‌কাবে না ? সারাক্ষণ চম্‌কাবে ! পুরুষ মানুষ তো তুমি !

প্রসাদ : আজ যে বড় ঝাঁঝ দেখ্‌ছি কথার !

ফুলি : হ'বে না ঝাঁঝ ? সব শুনেছি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, সব দেখিছি। আজকেও বড়দা তোমায় বাঁদর নাচ নাচালে ? হেসে-কেঁদে ঘেমে-কেশে আজও ভূত বনে গেলে ? ছিঃ ছিঃ ! তোমার যত বাহাদুরী আমার কাছে। বকুল তলায় দাঁড়িয়ে কত লম্বা চওড়া কথা শোনানো হোলো আমায়—'পষ্ট ক'রে কথা কইব, বাকী মাইনে চেয়ে নেব, কত কি !—আর বড়দার সাম্‌নে গিয়ে কুকুরের মত পা চাটতে লাগলে ! মা গো মা,—কী লজ্জা—কী ঘেন্না—

প্রসাদ : ফুলি—শোনো—

ফুলি : না, শুন্‌বো না। কথা কইব না তোমার সঙ্গে।

প্রসাদ : আহা—শোনোই না—

ফুলি : না শুন্‌বোনা। আজ থেকে কোনো সম্পর্ক নেই তোমার সঙ্গে।

প্রসাদ : (হতাশার সুরে) সম্পর্ক আর হোলো কই যে সম্পর্ক

ছেদ করছো? আমাকে দিয়ে কিছু হবে না ফুলি, আমি একেবারে অপদার্থ। আশা ভরসা আমি সব ছেড়ে দিয়েছি! তুমি রাগ কোরো না ফুলি—

ফুলি: আমি রাগ করলেই বা তোমার কি! আমি বুঝিনে ভেবেছ? বড়দার কাছে টাকাটা চেয়ে নিলে আমায় বিয়ে করতে হবে কি না, তাই তুমি নেকামি ক'রে আমায় ভুলোচ্ছো! (কাঁদ-কাঁদ হয়ে) আমার যেমন পোড়াকপাল--বাপ্ থেকেও নেই, কিন্তু দড়ি কলসী তো আছে—পুকুরের জলও শুকোয়নি—

প্রসাদ: (ব্যাকুল হ'য়ে) কেঁদোনা ফুলি, তা হ'লে আমিও কেঁদে ফেলবো কিন্তু।

ফুলি: ওমা—সত্যিই কেঁদে ফেল্‌লে যে!

প্রসাদ: (সামলে নিয়ে) আমার ভেতরে কী রকম করছে তুমি জানোনা ফুলি! বলতে কি চাইনি আমি? সারাক্ষণ ছট্‌ফট ক'রেছি বলার জন্যে। কিন্তু বল্‌তে গিয়ে গলায় কথা আটকে গেছে। শুধু যে ভয়ে তা নয়—বাবু চ'টে যাবেন, আগুন হ'য়ে গাল-মন্দ করবেন এসব ভেবে ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল সত্যি! কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়, আরও যেন কেমন একটা ভাব হচ্ছিল আমার। কেবলি মনে হ'চ্ছিল—বাবু কি ভাববেন, আমাকে আশ্রয় দিয়ে—

ফুলি: আশ্রয় কিসের? দিন নেই রাত নেই গাধার মত খাটছো না তুমি বড়দার জন্যে? গোড়ায় ঠিক হয়নি তোমার সঙ্গে যে বাড়ীতে থাকবে, খাওয়া আর মাইনে পাবে?

প্রসাদ: তা' অবশ্য হ'য়েছিল।

ফুলি: তবে?

প্রসাদ: তুমি বুঝবে না ফুলি! সব ঠিক কথা! কিন্তু বাবু কিছু মনে

কর্‌বেন, মুখ ভার ক'রে থাকবেন,—এই কথা ভাবলে আমার হাত পা অবশ হ'য়ে আসে। আর যদি তাড়িয়ে দেন—বলেন মাইনে নিয়ে ভাগো ?

ফুলি : ভাগবে। এখানে খেটে খাচ্ছো, অন্য কোথাও খেটে খাবে, আর—আর—আমাকে খাওয়াবে !

প্রসাদ : অজানা অচেনা জগতে কোথায় যাবো ফুলি ? কে আমায় আশ্রয় দেবে ? এই শরীর আমার একটুতেই ভেঙে পড়ে। বিদেশে কে আমার দিকে তাকাবে ! অজানা জায়গায় কত ভয়, কত কি বিপদ—

ফুলি : বুঝেছি। এমনি ক'রেই আমার দিন যাবে, নইলে তোমার মত লোকের সঙ্গে আমার ভাব হয় ! মেয়েলোক হ'য়ে লজ্জার মাথা খেয়ে এত যে পেড়াপিড়ি করি তোমায়, বুঝতে পারোনা কি জন্যে ? এ-বাড়ীতে থাকতে আমার দম আটকে আসছে। প্রতি মুহূর্তে সাধ যায় ছুটে পালিয়ে যাই।

প্রসাদ : তুমি কেন বাবুকে বলোনা ? তুমি ব'ল্‌লে বাবু শুনবেন। তুমি বাবুর বোন !

ফুলি : ওঃ—সেদিকে জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনে ! দাদাকে ব'লে তোমার পাওনা মিটিয়ে দেব। নিজে ঘটকালি ক'রে তোমার বিয়ে ক'রবো। তারপর ? তারপর আমাকেই তো বল্‌তে হবে—একটা চাকরী দাও বড়দা। সোয়ামীকে খাওয়াতে হ'বে ?—

প্রসাদ : সবাই অপমান করে ব'লে তুমিও আমায় অপমান কর্‌বে ফুলি ? আমি কি জানি না—আমি কত ভীরু, কত অপদার্থ ? জানি ব'লেই তো আরো ভীরু আরো অপদার্থ বনে' যাই। যা'রা সোজা মানুষের চোখের দিকে তাকায়, জোর গলায় কথা কয়, তাদের দেখি আর হিংসায় আমার বুক জলে যায়। দিনরাত কী যেন একটা লড়াই

চলে আমার মধ্যে, কি যেন একটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়—। আমি বড় দুঃখী ফুলি, আমার বড় কষ্ট। মরতে ভয় করে, নইলে—কবে আত্মহত্যা ক'রে বসতাম!

ফুলি : ছিঃ—ও-সব কথা বলতে নেই। নিজেকে তুমি ছোট মনে করো, নইলে আসলে তুমি মোটেই অপদার্থ নও। এ-বাড়ীতে মনুষ্যত্ব যতটুকু একমাত্র তোমার মধ্যেই আছে, আর সবাই তো অমানুষ। কারো ওপর অন্যায় করোনা, কারো মনে কষ্ট দাওনা—সব রকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করো—

প্রসাদ : আমার একটুও মনের জোর নেই, হয়তো তাই—

ফুলি : সহ্য শক্তি মনের জোর নয়? তুমি যে এতো সহ্য করো মুখ বুজে, মনের জোর না থাকলে কেউ তা' পারে?

প্রসাদ : সহ্যশক্তি না ছাই। ক্ষমতা নেই তাই সহ্য করি।

ফুলি : নিজেকে তুমি কেন যে এত হীন ভাবো—আমি তা' ভেবে পাইনে। যাক্‌গে—এ-সব কথা ঢের ব'লেছি, ব'লে কোন ফল হয়না। আচ্ছা, এক কাজ করো না কেন? বড়দাকে না বলতে পারো, বৌদিকে বলোনা কেন?

প্রসাদ : ও বাবা!

ফুলি : কেন? বৌদি তো তোমায় বেশ দরদ দেখায়। সর্বদা কাছে ডাকে, হেসে কথা কয়—

প্রসাদ : না, না.—ওনাকে আমি কিছু বলতে পারবো না।

ফুলি : আচ্ছা তবে আমিই বলবো'খন।

প্রসাদ : (সভয়ে) সর্বনাশ! অমন কাজও কোরোনা ফুলি। আমার বিষয় কোনো কথা কখনো তুমি ওনার কাছে বলতে যেয়োনা! বলো—বলবে না? কথা দাও!

ফুলি : কী ব্যাপার বলোতো ? আরেকবার তোমায় ব'লেছিলাম বৌদিকে সব জানিয়ে দিই, সেবারও তুমি এমনি ভয় পেয়েছিলে ! আমি বৌদিকে বলবো তাতে তোমার কি ? বলো, আজ তোমায় বলতেই হ'বে ।

প্রসাদ : (ইতস্ততঃ ক'রে) উনি আমার ওপর বড অত্যাচার করছেন, ফুলি ।

ফুলি : অত্যাচার করছে ! তোমার ওপর কী অত্যাচার ক'রেছে ?

প্রসাদ : আমার অবস্থা তুমি বুঝবেনা ফুলি ! বাবুর চেয়ে ওনাকে আমি আজকাল বেশী ভয করি । বাবুর গালাগালির চেযে ওনার মিষ্টি কথা আমার বেশী ভযানক লাগে । উনি কাছে এলে আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হ'যে আসে । উঃ --কী ফাঁদেই যে পড়েছি ! আমি— আমি ওঁকে ঘেন্না করি—কিন্তু কাছে যখন যাই—

ফুলি : যাও কেন কাছে ?

প্রসাদ : যাই না তো ! কিন্তু ডাকলে—না গিযে কি ক'রবো ? বাবুকে যদি বলে দেন আমি ওঁর কথা শুনিনি । যদি তাড়িযে দেন আমাকে ! তা'ছাড়া না গেলে উনিও তো রাগ করতে পারেন ! তাইতে যাই, ভবে ভয়ে । কাছে গেলেই আমি যেন নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি, জেগে থেকেও যেন ঘুমিযে গেছি মনে হয় । উনি যা বলেন তাই করি—! উনি বোধ হয কোনো মন্ত্র-তন্ত্র জানেন, ঐ যে বশীকরণ না কি বলে—

ফুলি : ছি ছি ছি ! বৌদি এমন মানুষ !

প্রসাদ : তুমি আমায় বাঁচাও ফুলি । আমায রক্ষা কর । এভাবে আর কিছুদিন চললে আমার মাথা খারাপ হ'য়ে যাবে, আমি পাগল হ'যে যাব !—ফুলি !

ফুলি : আমারও যে মাথা ঘুরুচে, এ-সব কি শোনালে তুমি আমায় ? চলো—আমরা পালিয়ে যাই। পাওনা টাকায় দরকার নেই, বিয়েতে দরকার নেই, আজকেই চলো—আমরা দু'জনে পালাই।

প্রসাদ : কোথায় পালাব ফুলি, তোমায় নিয়ে ? একা পালিয়ে যেতে ভরসা পাইনে, তোমায় নিয়ে কোথায় যাবো, কি কর্‌বো ? তা' ছাড়া, সবাই কি ভাববে ভাবো দিকি ? মামাবাবুর মনে কষ্ট হবে, বাবু রাগ কর্‌বেন—

ফুলি : মাগো, আমার কী হ'বে—(কান্না)

(দিগম্বরী ধীরে ধীরে ঘরে এল।)

দিগম্বরা : কাঁদচিস্ কেন লা ছুঁড়ি ! অ্যাঁ—?

ফুলি : (সামলে নিয়ে) কাঁদিনি তো।

দিগ : আ মরণ ! চোখে দেখলাম কাঁদছিস্, কানে শুনলাম কাঁদছিস্ —তবু বলে কাঁদিনি তো ! এ-ঘরে এসে প্রসাদের কাছে তোর কান্না কিসের লা ? জবাব দিসনে যে কথার ? আস্পাদ্দা বেড়েছে, নয় ?

ফুলি : বেশ করেছে বেড়েছে। তোমার মত তো বাড়েনি ?

প্রসাদ : (সভয়ে) ফুলি !

দিগ : কী বল্‌লি হারামজাদী ! আসুক্ তোর দাদা আজ বাড়ী, ওঁকে দিয়ে খড়মপেটা না করি তোকে, বাপের বেটী নই আমি !

ফুলি : আর আমি যদি বড়দাকে ব'লে দিয়ে—

প্রসাদ : (বাধা দিয়ে সভয়ে) ফুলি, ও ফুলি—কাকে কি বল্‌ছো ? —সর্ব্বোনাশ কোরোনা, রাগের মাথায় যা' তা বোলোনা গুরুজনকে। মাপ চেয়ে নাও পায়ে ধ'রে মাপ চেয়ে নাও।

ফুলি : কেন মাপ চাইব ? মর্‌তে জানি না আমি—

(কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেল)

দিগ : এ-সব কি প্রসাদ ?

প্রসাদ : আজ্ঞে ওর মাথার ঠিক নেই। ছেলেমানুষ কি না—

দিগ : নাও, তোমাকে আর ও-র সাফাই গাইতে হবে না। ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষী ঘোচাচ্ছি আমি, কালই দূর ক'রে দেব বাড়ী থেকে। কিন্তু, তোমার ছেলেমানুষ-কচি খুকীটি তোমার কাছে কান্না কাটি কচ্ছিল কেন শুনি ?

প্রসাদ : আঁ ? কি ? কি ?

দিগ : ন্যাকামী কোরোনা, স্পষ্ট ক'রে বলো।

প্রসাদ : আজ্ঞে, বল্‌ছিলো কি—খোঁড়া বলে ওকে কেউ ভালোবাসে না।

দিগ : তাই তোমার একটু ভালোবাসা চাইছিল—না ?

প্রসাদ : না, না—ছিঃ। কি যে বলেন! বল্‌ছিল কি—এখানে মন টিক্‌ছে না, কদমতলার পিসির কাছে যেতে চায়, আমি যদি আপনাকে ব'লে ক'য়ে—

দিগ : বানিয়ে বল্‌ছো—নিশ্চয় বানিয়ে বল'ছো! এতলোক থাক্‌তে তোমায় কেন বল্‌তে এলো শুনি ?

প্রসাদ : আজ্ঞে, দেখেছে তো আপনি আমায় একটু অনুগ্রহ করেন, আবদার কর্‌লে রাখেন—

দিগ : (খুসী হয়ে) তোমার ঐ আজ্ঞে হুজুর রাখোতো, ভাল্ লাগে না বাপু। সত্যি বল্‌ছো তো, পিসির কাছে যাবার কথা বল্‌ছিল ? না, ভাব-টাব হয়েছে তোমাদের দু'জনের ?

প্রসাদ : ছি—ছিঃ—!

দিগ : টের যদি পাই, কি কাণ্ড করি দেখো। খোড়া ডিঙিয়ে

খাস খাওয়া চলবে না—এই তোমায় বলে দিচ্ছি। কি দেখছো প্রসাদ অমন ক'রে ?

প্রসাদ : (মরিয়া হ'য়ে) আপনি আগুনের মত সুন্দর।

দিগ : বাবাঃ—কী কথার ছিরি! এত সুন্দর আমি, তবু তো না ডাকলে একবারটি চোখের দেখা দেখতে যাওনা!

প্রসাদ : ভয় করে।

দিগ : ভয় ? ভয় আবার কি, ভয় ? টান থাকলে যেতে।

প্রসাদ : আপনার জন্যে আমি মরতে পারি।

দিগ : মরতে পারো কিন্তু মাস্তি করে কথা কওয়া ছাড়তে পারোনা। কেউ তো নেই এখানে যে শুনবে ? কেমন ক'রে তাকিয়ে আছে ছাখো! ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছে। তুমি কি বলোতো প্রসাদ ? কি আছে তোমার মধ্যে ? (দাঁতে দাঁত ঘসে) এমন রাগ হয় আমার মাঝে মাঝে, ইচ্ছে করে—

বিশ্ব : (দূর থেকে)—প্রসাদ—!

প্রসাদ : (সভয়ে) আজ্ঞে—!

বিশ্ব : (কাছে এসে) এই রাস্কেল। তোমায় না বললাম—টাকা নিয়ে কারখানায় চলে যেতে ?

দিগম্বরী : বোকো না গো। ওর কোন দোষ নেই। আমি কথা কইছিলাম।

বিশ্ব : ওঃ—তাই নাকি। কি কথা কইছিলে ?

দিগ : বলছিলাম, বিয়ে ক'রে একটি টুকটুকে বৌ নিয়ে আসুক।

বিশ্ব : বিয়েটাই বাকি আছে। (হাসি)

দিগ : হেসোনা অমন ক'রে, বেচারী লজ্জা পাচ্ছে।

বিশ্ব : আচ্ছা, বিয়েটা পরে কোরে' প্রসাদ, এখন চট্‌পট্‌ কারখানায় চলে যাও তো! এই নাও টাকা, সাবধানে যেয়ো—

দিগ : পেনোর মাঠ পেরিয়ে যাবে তো? আমার জন্যে জাম পেড়ে এনো কিন্তু, প্রসাদ!

প্রসাদ : (সভয়ে) আজ্ঞে—আচ্ছা—!

বিস্তৃত পেনোর মাঠ। দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। প্রসাদ একা। ভয়ে ভাবনায় তার থমথমে চেহারা।

প্রসাদ : এই মাঠ পেরোতে হ'বে আমায়। এখনো বেশীর ভাগ পথ বাকী। ওদিকে আদ্দেক আকাশ দেখতে দেখতে মেঘে ছেয়ে গেল। ওঃ—কী ভীষণ চেহারা মেঘের। গুলিয়ে গুলিয়ে পাক্ খেয়ে খেয়ে আকাশ বেয়ে উঠ্‌ছে···এখুনি ঝড় উঠ্‌বে—! কি করি এখন? কোথায় যাই? এই মাঠের মধ্যে ঝড় উঠলে আমি তো বাঁচবো না! কি করি এখন? ফিরে যাব? ওরে বাবা, বাবু তা হ'লে আর রক্ষে রাখবে না। কিন্তু কি করি এখন? মাঠের মাঝখানে এসে পড়েছি, এদিকে গ্রাম যদ্দূর—ওদিকে কারখানাও তদ্দূর—!

(বাতাসের শব্দ)

আর বাঁচা গেল না! ঐ ঐ—ঝড় এলো—

(বাতাসের বেগ বাড়তে থাকবে)

ওরে বাবা—এযে অন্ধ হ'য়ে গেলাম ধূলোয়! শুক্‌নো ডালপালা

এসে চাবুকের মত গায়ে পড়ছে। পালাতে হ'বে। কোন্দিকে পালাই? হ্যাঁ কোন্দিকে পালাই?

(বাতাস বইতে থাকবে তেমনিভাবে)

উঃ—পড়ে গেলাম যে! কিন্তু প'ড়ে গেলে তো চল্‌বে না। উঠে পালাতে হ'বে। উঃ—আবার ফেলে দিলে—আমায পালাতে দেবেনা—! ঝড় এইখানে ফেলে আমাকে মেরে ফেল্‌বে। আমি মর্‌বোনা—মর্‌তে পারবো না।

(বাতাসের সাথে বৃষ্টি ও বিদ্যুতের শব্দ—)

উঃ—গেলাম—গেলাম—কান ফেটে গেল!—

(গাছ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ)

(আর্তনাদ ক'রে) আঃ—! গাছ ভেঙে পড়েছে! অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। শুধু ডালপালার ঘা' লেগেছে। মনে হোলো কে যেন হাজার চাবুক দিয়ে আমায় মারলে! এখানে গাছের কাছে থাকলে তো চল্‌বেনা, ফাঁকায় যেতে হ'বে। গাছের কাছ থেকে সরে যেতে হ'বে।—

(বাতাসের সাথে বৃষ্টি ও বিদ্যুতের শব্দ)

এখানে গাছ নেই এইখানেই একটু বসি। পালাতে পেরেছি—কেউ আর গাছ চাপা দিয়ে আমায় মারতে পারবে না। এখান থেকে আর নড়ছি না আমি। এই গ্যাট হ'য়ে বস্‌লাম, মরিতো এইখানে বসে মর্‌বো।

(ঝড়ের দিকে মুখ করে)

আয আয়

(উন্মাদের মত হাসি)

—আরো জোরে আয়—ছিষ্টি তলিয়ে দে! পেসাদচন্দর আর ডরায়

না।—যামুবি তো যার—দিশেহারা হ'য়ে ছুটোছুটি আর করছিনে বাবা—আমায় নিয়ে ছিনিমিনি আর খেল্‌তে দিচ্ছি না! তোর ঝড়ের নিকুচি ক'রেছে। আয দেখি তোর কত জোর! আরো জোরে আয়!

(খুব জোরে বাতাসের শব্দ হ'য়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়)

প্রসাদ: ঝড একটু কম মনে হচ্ছে। কোথাও আশ্রয নিতে পারলে হত।

(ট্রেনের হুইসেল্)

একি! ছুটোছুটি করতে রেল লাইনের এত কাছে এসে পড়েছি। ট্রেন দাড়িযে আছে না একটা? ওই তো পেছুনের আলো দেখা যাচ্ছে। লাল একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। দিগম্বরীর কপালের সিঁদুরের মত। দিগম্বরী? ওই যত নষ্টের গোড়া। ওর জন্তে জাম পাড়তে গিয়েই তো দেরী হযে গেল। নইলে ঝড ওঠবার আগেই হয়তো মাঠ পেরিয়ে যেতাম!

(ট্রেনের হুইসেল্)

গাছটাছ বোধ হয ভেঙ্গে পড়েছে লাইনে। ট্রেনটা দাঁড়িয়েই আছে। এক কাজ করলে হয না? এখানে বসে না থেকে ট্রেনের একটা কামরায় ঢুকে তো বসতে পারি ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত। তাই করা যাক। কেন এখানে বসে কষ্ট পাই মিছিমিছি!

(উঠে এগিয়ে যায)

(ট্রেন দাঁড়িয়ে। যাত্রীদের কোলাহল)

যাত্রী : বসুন না। বসে পড়ুন। এ্যাক্‌সিডেণ্ট নাকি ?

প্রসাদ : না! এ্যাক্‌সিডেণ্ট নয়।

যাত্রী : রক্তে যে মাখামাখি হয়ে গেছেন !

প্রসাদ : রক্ত ?

যাত্রী : জল, কাদা, রক্ত সব আছে। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে আপনাকে। রুমালটা নিন। মুছে ফেলুন।

প্রসাদ : থাক ! একেবারে বাড়ী গিয়ে চান করে ফেলব। ঝড়ের মধ্যে ছুটোছুটি করতে গিয়ে আছাড় খেয়েছি। একটু কেটে ছড়ে গেছে আরকি !

যাত্রী : একটু ! আপনি তো খুব বেপরোয়া লোক দেখছি। ঝড়ের সময় বাইরে ছুটোছুটি করতে ভালবাসেন বুঝি ? আমারও মশায় এমনি স্বভাব ছিল ছোটবেলায়। ঝড় উঠলে ফুর্তির চোটে কি করবো ভেবে পেতাম না।

প্রসাদ : বলেন কি ?

যাত্রী : আপনাকে দেখে সাধ হচ্ছে আমিও বাইরে গিয়ে একটু মাতামাতি করে আসি।

প্রসাদ : আপনি কোথায় যাবেন ?

যাত্রী : ভিজিগাপট্টম।

প্রসাদ : সে তো অনেক দূর !

যাত্রী : (হেসে) দূর তো হয়েছে কি ! সেখানেই থাকি, ব্যবসা আছে !

প্রসাদ : দেশ ছেড়ে এত দূরে গিয়ে—

যাত্রী : আর বলেন কেন। বারো বছর বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়েছিলাম বোম্বাই। তার পর থেকে পনের বিশ বছর ধরে এখানে ওখানে পাক খেতে খেতে ভিজিগাপট্টমে ব্যবসা ফেঁদে বসলাম। সেখানেই আটকে গেছি সেই থেকে।

প্রসাদ : বারো বছর বয়সে ? ভয় হয়নি ?

যাত্রী : ভয় ? ভয় কিসের ?

প্রসাদ : এই অজানা অচেনা যায়গায় যাবেন, কোথায় থাকবেন, কি করবেন—

যাত্রী : যায়গা কি অজানা অচেনা থাকে ? যতক্ষণ না যাবেন, ততক্ষণ। গিয়ে পড়লেই জানাশোনা হয়ে যায়। মানুষের বাচ্চার আবার থাকার ভাবনা। সব জুটে যায়। পাহাড়ে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে, মানুষ নিজের ব্যবস্থা ক'রে টিকে আছে।

(ট্রেনের হুইসিল)

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। চট করে নেমে পড়ুন।

প্রসাদ : আপনার নামটি জানতে পারি ?

যাত্রী : প্রসাদ। আপনার ?

প্রসাদ : আমারও ওই নাম, প্রসাদ।—

(ট্রেণ চলার শব্দ এবং আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে যাবে)

বিশ্বম্ভর : আঃ! কি গন্ধই বেরিয়েছে তোমার মাংসের! জিভে জল আসছে!

দিগম্বরী : খাবে নাকি এখন ?

বিশ্বম্ভর : একটু পরে ! খিদেটা চড়িয়ে নিই ! বৃষ্টি ধরে এসেছে, মামা এইবার এসে পড়বে। কিবে ফুলি, তোর মুখ এত শুকনো কেন ?

ফুলি : দাদা, প্রসাদবাবু এলোনা কেন এখনো ?

বিশ্ব : প্রসাদবাবু ! প্রসাদ আবার বাবু হ'ল কবে থেকে রে ? ওটাকে অত সম্মান করে কথা বলিস নে ফুলি, শুনলে হাসি পায়।

ফুলি : 'ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছে—

বিশ্ব : ওটা একটা বাঁদর, আস্ত বাঁদর ! ওটাকে সত্যি মানুষ বলে মনে হয় না !

ফুলি : মানুষ হতে দিলে মানুষ হত। তোমরা সবাই মিলে ওকে পায়ের নীচে পিষে রেখেছ !

দিগ : তা, ওর জন্যে তোর এত দরদ কেন শুনি ? ঝড় ওঠার সময় থেকে ছটফট করছিস, কোথায় গেল, কি হ'ল।

ফুলি : দরদ আবার কি ! লোকটা কেমন ভীরু তাতো জানন। ঝড়ের সময় বাড়ীতে থাকলে ঘরের কোণে লুকিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকে। সেই লোক এই ঝড়ের মধ্যে বাইরে আটকে গেছে, হার্ট ফেল ক'রে মরে গেছে কিনা কে জানে !

বিশ্ব : তা ও মরতে পারে, আশ্চর্য্য নয় !

ফুলি : কেন তবে পাঠালে তুমি ওকে ? ঝড় আসছে জেনেও পাঠালে কেন ?

বিশ্ব : (গর্জ্জন করে) কি বললি ! আমার চাকরকে আমি কোথায় পাঠাব, সে কৈফিয়ৎ তোর কাছে দিতে হবে ?

দিগ : তোর বাপও তো ঝড়ের মধ্যে বাইরে গেছে। বাপের জন্যে তো এতটুকুও ভাবনা দেখছি না তোর।

ফুলি : বাবার কিছু হবে না। বাবা ওর মত ভীরু নয়।

দিগ : প্রসাদ তোর কে?

ফুলি : কে আবার। কেউ না।

দিগ : স্বয়ম্বরা হবার সাধ আছে নাকি গো কন্তে? তাই তো বলি, একা পেলেই মেয়ে গিয়ে পেসাদের কাছে ঘুর ঘুর করেন।

(গজেনের প্রবেশ)

গজেন : (একটু জড়ানো গলায়) কি হয়েছে?

বিশ্ব : বাঃ! মামা যে বেশ সরগরম দেখছি।

দিগ : শুনছ? তোমার মামাকে বলে দাও, সাতদিনের মধ্যে যদি মেয়ের বিয়ে না দেন তো আমার বাড়ীতে জায়গা হবে না। মেয়ে ধেড়ে করে রাখতে চান অন্ত জায়গায় রাখুন গে। এখানে চলবে না। বলে দাও মামাকে।—

বিশ্ব : আর বলে দিতে হবে না। মামার কান আছে।

গজেন : বৌমাকে শুধোও দিকি ফুলি কি করেছে।

বিশ্ব : শুনলে তো? জবাব দাও!

দিগ : মামাকে বলো. ওনার মেয়ে নিজেই বর খোঁজবার চেষ্টায় লেগেছেন। ক'দ্দুর কি করেছেন উনিই জানেন।

ফুলি : (তীব্রকণ্ঠে) বৌদি!

(গজেন মেয়ের গালে চড় বসিয়ে দিল : ফুলি কাঁদল না। তীব্র দৃষ্টিতে নীরবে চেয়ে রইল।)

বিশ্ব : কি করছো মামা? অত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলে?

গজেন : সামনে যে ভাল দিন আছে, বংশীর সঙ্গে সেই দিনে বিয়ে দিয়ে দেবো।

বিশ্ব : আমার আড়তের বংশী ? না, না, ও গাঁজাখোর বুড়োর সঙ্গে নয়। বরং পেসাদের সঙ্গেই দাও না মামা।

দিগ : তুমি চুপ করো। পেসাদের সঙ্গে ওর বিয়ে হয় না।

বিশ্ব : কেন ? ওরা তো স্বঘর।

দিগ : হোক স্বঘর। পেসাদ ওকে বিয়ে করবে না। ওকে পেসাদ দেখতে পারে না। ওর রকম সকম দেখে পেসাদ সেদিন আমার পায়ে ধরে কেঁদেছিল। আমি বললাম, কাঁদছ কেন পেসাদ ? পেসাদ বললে, আপনি আমায় রক্ষে করুন ও ডাইনির হাত থেকে।

(গজেন আবার ফুলিকে মারতে হাত তোলে।)

বিশ্ব : মামা ! ফের হাত তুলছ ? একবাব বারণ করলাম, কানে গেল না বুঝি ? বড তো স্পর্দ্ধা বেড়েছে তোমার ! কাঁদিস নে ফুলি।

দিগ : যা তুই। যা এখান থেকে।

বিশ্ব : পেসাদ তোমার পাযে ধরে ওকথা বললো ? ডাইনীর হাত থেকে রক্ষা করুন ! ছোঁড়াটা তো শুধু ভীরু অপদার্থ নয়—বজ্জাতের ধাড়ি ! হারামজাদা আজ আসুক।

দিগ : তুমি পেসাদকে কিছু বলতে পাবে না।

বিশ্ব : কেন ?

দিগ : ওর কোন দোষ নেই। ফুলিকে ওর পছন্দ হয় না, ফুলি ওকে জ্বালাতন করে। বেচারী ভযে ভাবনায় কাঠ হয়ে থেকেছে। কখন কী করে বসবে হতচ্ছাড়ি মেয়ে, দোষ তো হবে পেসাদের। তুমি নিজেই তখন ওর ঘাড় মটকাবে।

বিশ্ব : মাঝে মাঝে সত্যি ইচ্ছে করে ওর ঘাড়টা মটকে দিতে। ওই যে আসছেন পেসাদবাবু। এঁ্যা ! কি চেহারা হয়েছে ছোঁড়ার !

দিগ : ইস্ !

(জল কাদা রক্তমাখা ঝড়ে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে প্রসাদ এল। তার পদক্ষেপ দৃঢ়। মেরুদণ্ড সিধা।)

প্রসাদ : কারখানায় যেতে পারি নি।

বিশ্ব : কেন ?

প্রসাদ : পেনোর মাঠে ঝড়ে আটকে গেলাম।

বিশ্ব : আটকে গেলে। মাঠটুকু পেরিয়ে কারখানায় যেতে পারলে না ? ভ্যাবা গঙ্গারাম কোথাকার !

দিগ : পেসাদ ! একি ভীষণ চেহারা হয়েছে তোমার। কাদা রক্ত ধুয়ে এসো, চান করে এসো। তোমায় দেখে ভয় হ'চ্ছে।

বিশ্ব : টাকা দিয়ে যাও।

প্রসাদ : আজ্ঞে টাকাটা—

বিশ্ব : টাকা হারিয়ে এসেছিস !

প্রসাদ : ঝড়ের সময় পেনোর মাঠে কোথায় পড়ে গেছে।

বিশ্ব : হতভাগা ! নচ্ছাড় !

(বিশ্বনাথ লাফিয়ে উঠে তাকে মারতে যায়।)

প্রসাদ : (ভয়শূন্য বিস্মিত কণ্ঠে) আমায় মারবেন ! আমি ভদ্রলোকের ছেলে, কটা টাকার জন্য আমায় মারবেন !

বিশ্ব : না, মারবো না, পুজো করবো। তোকে বেচলেও অতগুলো টাকা হবে না, তা জানিস ?

প্রসাদ : (চাপা দৃঢ় গলায়) গায়ে হাত দেবেন না। খপর্দার গায়ে হাত দেবেন না বলছি !

বিশ্ব : (সুর বদলে) তুমি কি গাছ চাপা পড়েছিলে ?

প্রসাদ : না, চাপা পড়ছিলাম, অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। টাকাটা যদি না পাওয়া যায়, আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।

বিশ্ব : তোমার মাইনে !

গজেন : ওরে ছোঁড়া ! তোমার পেটে চালাকি ! টাকা তুমি হারাও নি—মাইনে ব'লে আদায় ক'রে নিয়েছ। জানো বাবা, ক'দিন থেকে মাইনে মাইনে করে আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে। তোমায় বলতে সাহস হয় না, আমার কাছে ঘ্যান ঘ্যান করে। চাইলে পাবে না জানে, তাই চালাকী ক'রে বাগিয়ে নিল। টাকা হারিয়েছে মাইনে থেকে কেটে নিও।

প্রসাদ : আমার তিন বছরের ওপরে মাইনে বাকী আছে !

বিশ্ব : তোমার আবার মাইনে ! খেতে পরতে দিয়েছি !

প্রসাদ : খাওয়া পরা আর তিরিশ টাকা করে মাইনে দেবেন বলেছিলেন। যে, টাকা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশীই পাওনা হবে আমার।

বিশ্ব : তোমার কি হয়েছে হে বাপু ? কামড়ে দেবে নাকি ?

প্রসাদ : কামড়ে দেব কেন ?

বিশ্ব : রকম দেখে তাইতো মনে হচ্চে ! চান করবে যাও। মাথা ঠাণ্ডা হোক ! তারপর কথা কইব !

প্রসাদ : আমার মাথা গরম হয়নি।

বিশ্ব : বেশ বেশ, জামা কাপড় ছাড়বে তো ? ভাল ক'রে সাবান মেখে চান করগে ! ভাল করে ধুয়ে যেখানে যেখানে কেটে গেছে টিঞ্চার আইডিন লাগিয়ে দিও ! একটু ব্র্যাণ্ডি খাবে ?

প্রসাদ : না, আমি কিন্তু চোর নই ! টাকাটা সত্যি পেনোর মাঠে পড়ে গেছে।

বিশ্ব : না বলছে কে !

প্রসাদ : খুঁজে পেলে টাকাটা আমি মাইনে বাবদ নেব।

বিশ্ব : আচ্ছা আচ্ছা সে হবেখন। চলো মামা, আমরা একটু টানিগে।

(বিশ্বম্ভর ও গজেন তার দিকে তাকাতে তাকাতে একরকম পালিয়ে যায়।)

দিগম্বরী : তোমায় দেখে ভয় করছে পেসাদ। কি চেহারা হয়েছে তোমার। উনি পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন।

প্রসাদ : ভয় পেলেই মানুষ ভয় পায়!

দিগম্বরী : অমন করে তাকিও না! আমার গা কাঁপছে। নেযে এসো, গরম গরম মাংস দিয়ে ভাত দেব।

প্রসাদ : তোমার রান্না আমি খাব না।

দিগম্বরী : খাবে না? কেন?

প্রসাদ : ঘেন্না করবে! এতকাল ঘেন্না করেছে—তবু তোমার রান্না চোখ কাণ বুজে খেয়েছি। আর খাব না!

দিগম্বরী : (রেগে) কি বললে? (ভয়ের সুরে) না না অমন করে তাকিয়ো না! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ পেসাদ? তোমার চোখ দেখে ভয় করছে। কেন তাকাচ্ছ অমন করে? কেন ভয় দেখাচ্ছ? আচ্ছা আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

(দিগম্বরী পালিয়ে যায়।)

ফুলি : ওগো মাগো, তোমার কি হয়েছে। কোথায় তুমি ছিলে? এমন লাগল কিসে?

প্রসাদ : আমার কিছু হয়নি ফুলি! শরীর থেকে কিছু রক্ত বেরিয়ে গেছে। কিন্তু উপকার যা হয়েছে বলার নয়! ফুলি, আজ আমি মুক্তি পেয়েছি—নিজের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। আমি কাউকে ভয় করি না। আমি স্বাধীন।

ফুলি : কি বলছ তুমি ?

প্রসাদ : ঠিক কথাই বলছি। পেনোর মাঠে কাল-বোশেখীর ঝড়ে লড়াই করে আজ মরে বেঁচেছি। আমি ভয় করতে ভুলে গেছি ফুলি! বাড়ী এসে বিশু বাবুকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হলো, এই একটা সামান্ত দুর্বল মানুষকে আমি এত ভয় করতাম! তারপর টাকা হারিয়েছি বলে বিশুবাবু যখন আমায় মারতে এলেন, প্রথমটা আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কিন্তু চেয়ে দেখি বিশুবাবু ভয় পেয়েছেন। কাছে এসে আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয়ে বিশু বাবুর বুক কাঁপছে। জানো ফুলি, আমায় দেখে বিশু বাবু ভয় পেয়েছেন!

ফুলি : আমি দেখেছি। বৌদিও তো ভয় পেয়ে চলে গেলেন।

প্রসাদ : হ্যাঁ।

ফুলি : আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি না।

প্রসাদ : ভয় পাচ্ছ না তো ? তবে চলো পেনোর মাঠে যাই। একটা লণ্ঠন নিয়ে চলো। আমি জামা কাপড় বদলে আরেকটা লণ্ঠন নিয়ে বাঁশতলায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তুমি ওইখানে যেও। ওখান থেকে দুজনে মিলে পেনোর মাঠে গিয়ে টাকাটা খুঁজে তিনটের গাড়ীতে ভিজিগাপট্টম চলে যাব!

ফুলি : ভিজিগাপট্টম ? সে কোথায় ?

প্রসাদ : সেখানে আমার মিতা থাকে।

আপদ

চাল নেই? বাঃ, বেশ!

সকালবেলা কি শুভ সংবাদ! স্বাধীনতা পাওয়ার বাসি পচা সংবাদটার মত। জর্জর প্রাণে আরেক দফা জ্বর এনে দেয়। রাত্রে নলিনী খবরটা চেপে গিয়েছিল; আপিস ফেরৎ কেরানী বেচারাকে তখন ও-খবরটা জানিয়ে আর লাভ কি। কালোবাজারে ছাড়া চাল নেই। হোক সে সরকারী কেরানী, স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের বেতনভুক্ত। রাতারাতি চাল বাড়ন্ত সমস্যার সমাধান করার সাধ্য তার নেই। নলিনীর মতে, সরকার স্বাধীন বলেই কেরানীদের দাসত্বের ডিগ্রি চড়েছে। তার যুক্তি আর ব্যাখ্যা একটু তির্যক ও রসালো হয়, কারণ সে কথাগুলি রসিকতা করেই বলে। এত চড়া তার ক্ষোভ যে বেশি তেতে লোহা জ্যোতির্ময় হওয়ার মত তার প্রাণের জ্বালা ব্যঙ্গ হয়ে বিচ্ছুরিত হয়!

আমি কি করব? নলিনী আলগোছে বাঁকা হাসি হেসে বলে, তোমরা স্বাধীন হয়েছ, আমরা ত হইনি। আমরা ঘরের কোণে হাঁড়িই ঠেলছি। হাঁড়ি চড়াবার ব্যবস্থা তোমরা বাদ দিয়েছ, আমরা করব কি?

কেউ যেন তাকে কিছু করতে বলেছে! এই রকম ঢং হয়েছে নলিনীর কথার, শুধু আজকাল নয়, অনেকদিন থেকে। আগে অন্য কথার ঠেকা দিত, আজকাল কথায় কথায় এই স্বাধীনতার কথা তুলে খোঁচায়। কথা আরম্ভ করে 'আমি' দিয়ে, পরক্ষণে তা দাঁড়ায় 'আমরা ও তোমরা'র ব্যাপারে। সে যেন কনাদ রায়ের বৌ নয়, সে ভিন্ন একটা জাতের একজন এবং কনাদ অন্য একটা জাতের

প্রতিনিধি। ঘরে চাল নেই এ কি নতুন কিছু? প্রায়ই একরকম চাল থাকে না, প্রায় সকলের ঘরেই। নলিনী এমনভাবে খবরটা দেয় যেন তারই পরামর্শে গভর্ণমেণ্ট ঘরে ঘরে চালের অনটন ঘটিয়েছে, লোভী ব্যবসায়ীদের চাল আটা কাপড়চোপড় সিকেয় তোলার ষড়যন্ত্রে সেও যেন একজন অংশীদার। সেই যেন এই বিশ্বাসঘাতকের জগতে সবার সেরা বিশ্বাসঘাতক।

ঘরের কোণে হাঁড়ি ঠেলে বলে? অন্তদের হাতের কাছে পায় না, একমাত্র পুরুষ তাকেই পায় বলে? কিন্তু তাকে পুরুষ মনে করে কি নলিনী! কথা শুনে সন্দেহ জাগে আজকাল!

আজকেই চাল ফুরোল? বিষ্যুদ্‌বার পর্যন্ত যেত না?

পেট বাড়েনি দুটো?

বাড়িতে লোক বাড়ে নি, পেট বেড়েছে দুটো, পেট! কথার কি ছিরি নলিনীর। পাকিস্থান থেকে দু'জন আত্মীয় এসে ঘাড়ে চেপেছে বটে এবং তাদের পেট ভরাতে হওয়ায় রেশনের আইনী চাল-আটা মঙ্গলবারেই শেষ হয়েছে। রেশন কার্ড সংগ্রহের হাঙ্গামা চুকলে আশা করা যায় ভবিষ্যত সপ্তাহে আবার বিষ্যুদ্‌বার পর্যন্ত সরকারী বরাদ্দ খাদ্য টানা চলবে। শুক্রবার সকালে নলিনী মনে করিয়ে দেবে ঘরে একদানা চাল নেই, একগুঁড়ো আটা নেই—তার আগে নয়। তখন চোরাবাজারে যাবে চালের সন্ধানে। বার বার এই কথা ভেবে বুকে বল পাওয়া যাবে যে মোটে তিনটি দিন, শুধু আজ কাল আর পরশু, শুক্র, শনি আর রবিবারটা চোরা চালে কোন রকমে চালান—হিসেব করে, আরও কম খেয়ে, কোনরকমে। সোমবার আবার রেশন মিলবে!

নলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে ইঁট-সুরকি সিমেণ্টের নূতন গাথনিটার দিকে। বাড়ির পাশে কি তাড়াতাড়ি যে গড়ে উঠছে সিনেমা হাউসটা।

ওষুধের নেশায় মত সস্তা আনন্দের জলো দু'টি ঘণ্টার জন্ত বিব্রত অতিষ্ঠ মানুষ পয়সা দিচ্ছে, সে লাভে ভাগ বসাতে একদিন দেরিও যেন সইবে না।

তাড়াতাড়ি গড়ে তোলো, রোশনাই জ্বালো, দুয়ার খুলে দাও—কিছু রেডিও মার্কা মাছি ওড়া সুরের ভনভনানি, কিছু দেশপ্রেম আর বিপ্লবী নায়ক-নায়িকার বাসরঘরের বিপ্লবে সমাপ্তি, এরই জন্ত ভিখারীর মত মেয়ে-পুরুষ এসে ভিড় করুক টিকিট ঘরের দরজায়!

নিজের চিন্তায় চমক লাগে কনাদের—এ তার স্বকীয় নয়, নলিনীই এমনি কর' বলে। চোখে কি জল নলিনীর? না চকচক করছে মনের জ্বালায়?

কি ভাবছ জানি, নলিনী ভারী গলায় বলে, নিজের পেটে পুরিনি আমি সব। কাল রাত্রে উপোস গেছে আমার। আচমকা মুখ ফিরিয়ে সে মুচকে হাসে, মেয়েরা উপোস দিলে আগে মাছের একটা আঁস দাঁতে কাটত। মাসের ন' দশ তারিখ হল মাছের গন্ধও আসে না বাড়িতে। কি করি বল? তোমরা স্বাধীন হয়েছ—

থলি দাও। দুটো দিও, বাজারটাও সেরে আসব।

থলি নিয়ে কনাদ পালিয়ে যায়।

কিছুদিন আগেও কনাদ বোঝাত, তর্ক ও রাগারাগি করত। শেষে বলত, তুমি কি বুঝবে, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার ত্যাগ নেই, ধৈর্য নেই, তুমি স্বার্থপর! সম্প্রতি সে আর উৎসাহ পায় না। যত সহজ ভেবেছিল অত সহজ নয় ব্যাপার, না স্বাধীনতার প্রশ্ন না তার প্রতি নলিনীর অদ্ভুত জ্বালার মানে। ছোট ভাই চেঁচিয়ে পড়ছে, এমনি চেঁচিয়ে সেও একদিন

পড়ায় মন বসাত, আলস্য কাটাত। পূর্ব-বঙ্গের পলাতকা আত্মীয়া দু'টি, মা ও মেয়ে, সেঁৎসেঁতে উঠানটুকুর কোণে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে—সবাইকে খেতে দিয়ে নলিনী যে কাল না খেয়ে ছিল সেই বিষয়ে কি? অথবা নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে? কাকীমা আর খুকীকে এখানে রেখে রমেশকাকা ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠে যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে সেজন্য কনাদের কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। তবু কাকীমা আর খুকীকে তাব মারতে ইচ্ছা হয়।

এত সকালেই সিনেমা হাউসটার কাজ শুরু হয়ে গেছে, সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ চলবে। মিস্ত্রী আর কুলিবা কিরকম মজুরি পায়? ভালই পায় নিশ্চয়, দিন ভালই চলে নিশ্চয়, নইলে কথায় কথায় স্ট্রাইক করার এত তেজ কোথায় পেত! হলদে কার্ডে ওদের রেশন পর্যন্ত বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে দেশের এমন সঙ্কটের সময়ে। ভবিষ্যৎ গড়বার বা ভাঙবার এই সন্ধিক্ষণে, ওরা যদি শুধু আদায় করার ফিকির ছেড়ে এই দুর্দিনে—

এ যেন মুখস্থ করা চিন্তা, তোতাপাখির মত শুধু আবৃত্তি করা নিজের মনে, পরের কাছে। নিজের মনও আর সায় দিত চায় না। ইঁট গেঁথে গেঁথে নূতন দালান উঠছে, তার বিশ্বাসের ইমারত পড়ছে ভেঙে ভেঙে। ভালই যদি চলে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে যদি তেজ বাড়ে, উদয়াস্ত খেটে কেন মরবে মানুষ? নিজেই কি সে খাটত?

নলিনী বলে, বোকো না বেশি। এতটুকু আশা ভরসা থাকলে মানুষ যেন কষ্ট সইতে নারাজ হয়। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আধপেটা খেয়ে প্রাণপাত করে না মানুষ একটু সংস্থানের জন্য? মানুষ কি ভূত যে সুখে থাকতে নিজেকে কিলোবে? ত্যাগ ত্যাগ করে তোমরা সবাইকে সন্ন্যাসী বানাতে চাইছ!

তোমরা! তাকে 'তোমরা' ছাড়া সম্বোধন করতে নলিনী ভুলে

গেছে। দেশকে ভালবাসে বলে নলিনী বড় শ্রদ্ধা করত তাকে, নিজেকে উজাড় করে উন্মুখ অতল ভালবাসায় তার জীবন ভরে রাখত। নলিনী ভুলে গেছে, আজও সে দেশকে ভালবাসে। কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে, কত অল্পদিনে! যুদ্ধ, বোমার ভয়, দুর্ভিক্ষ হাসিমুখে হেলায় পিছনে ঠেলে দিয়েছে, কিসের সমস্যা কিসের কি, তুমি আছ আমি আছি! একটি মেয়েকে জন্ম দিতে সব ভুলে গেছে নলিনী। কলকাতায় তখন দাঙ্গা। চারিদিকে বিদ্রোহ-হাঙ্গামা, তারপর বিভীষিকা। ভয়ে নয়, নলিনীর ভাবান্তর দেখে তাকে কনাদ ক'মাসের জন্য বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল!

তবু তাকে বাঁচিয়ে চলে কেন নলিনী? রাত্রে কেন তাকে জানায় না ঘরে চাল নেই, সে না খেয়ে পেটের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে পাশে এসে শুয়েছে? আদর করতে চেয়ে কাছে টানায় খানিক্ষণ সে কাঠ হয়ে থেমে ছিল, হাত সরিয়ে দিয়েছিল। কত দুঃখ আর ক্ষোভের সঙ্গে নলিনীকে তখন তার মনে হয়েছিল স্বার্থপর, এখন নিজের সেই জ্বালার কথা ভেবে লজ্জায় কনাদের মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে সাধ যায়। সারাদিন খেটে মেয়েকে মাই খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে নলিনী শুয়েছিল অন্যদিনের মতই, সে টেরও পায়নি যে তার একমুঠো ভাত জোটে নি। তারপর নিজেই নলিনী পাশ ফিরে তার গলা জড়িয়েছিল। এটাও তার নলিনীর স্বার্থপরতাই মনে হয়েছিল। সকালে এখন আকাশে সূর্য উঠেছে, নোংরা রাস্তায় মানুষের ঠাসাঠাসি ভিড়, বাজারে তার পাশে দাঁড়িয়ে নলিনীর মতই রোগা ফোলা চোখ মুখ, আলুথালু কুৎসিৎ শিথিল ভঙ্গিতে শাড়ি জড়ান বস্তির একটি সস্তা বেশ্যা আধপোয়া কুঁচো চিংড়ি কিনছে। ভগবান আছেন বলে আর ভরসা নেই কনাদের, সত্য আর আদর্শও হয় ত নেই, তবু কনাদ নিজের কাছে স্বীকার করে যে এখনও নলিনীকে সে স্বার্থপর

বলেই ভাবছে। নলিনী জানে তার জন্তই তার সব, বর্তমানের খাওয়া-পরা ও ভবিষ্যতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরম-বিরাম। তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে নলিনী তাকে রাত্রে চালের কথা না বলে তাকে ঘুমোতে দেয়, তাকে বেশি চটান উচিত নয় ভেবেই উপোসী অবশ দেহটাকে পাশ ফিরিয়ে শীর্ণ হাত দু'টিকে তার গলায় জড়িয়ে দেয়! সে বাঁচলে, সে খুশি থাকলে তবেই নলিনীর স্বার্থ বজায় থাকবে।

কুঁচো চিংড়ি দেড়টাকা সের! একদিন মাছ ছাড়া নলিনীর মুখে ভাত রুচত না। বেশি দিনের কথা নয়। দুধ-ঘি, পোলাউ-মাংস কে চায়, নলিনী বলত, জন্ম জন্ম তুমি শুধু আমাকে একটুকরো মাছ দিয়ে ভাত খাইয়ো—আমি হাতীর মত খাটব এখন অর্ধেক মাস বাড়িতে আঁসটে গন্ধ ঢোকে না। এ নালিশও নলিনী ভুলে গেছে।

ধরুন—বাবু, একপো।

দাঁড়াও বাছা, কনাদ চিন্তার ভাণ করে অভিনয়ের ভঙ্গিতে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, বেলা হয়ে গেছে, চিংড়ি বাছবে কে? তার চেয়ে বরং—

মেছুনিও হাসে, বলে, ইলিশ পোনা নাও বাবু, কে বারণ করছে?

খুচরো টাকাপয়সা ছিল না, দশ টাকার একটা নোট নিয়ে বাজারে এসেছে। হায় রে রোমাঞ্চকর অভিজাত দশ টাকার নোট! পাঁচ সের চোরাবাজারী চাল কিনতেই তার চারটে টাকা খরচ হয়ে গেছে। মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, তবু পকেটে টাকা আছে বলেই কি কনাদ আজ ছ'আনার কুঁচো চিংড়ি বদলে পাঁচসিকে দিয়ে বাচ্ছা একটা ইলিশ কিনবে? এটা কি উচিত? এমন ঝোঁকের মাথায় কাজ করা? ইলিশের দাম দিতে দিতে কনাদের মনে পড়ে বহুদিন আগে, বছর পনের আগে প্রবাসীতে একজন কেরানীকে নিয়ে লেখা একটা গল্প পড়েছিল।

মাটির মাশুল

প্রবাসীর গল্প প্রতিযোগিতায় তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরস্কার পেযেছিল গল্পটা, বোধ হয় মানিক বন্দোপাধ্যাযের লেখা। দেশের জন্য চাঁদা তুলতে বেরিয়েছিল শোভাযাত্রা, তারই মত অভাবগ্রস্ত এক কেরানীর প্রাণটা আকুল হয়েছিল চার আনা চাঁদা দিতে চেয়ে। খুচর ছিল না, শুধু একটা দশ টাকার নোট। বোধ হয় বাকী মাসটা সংসার চালাবার শেষ সম্বল। তার সামান্য দান কেটে নিতে বলে বাকী টাকা ফেরত চেয়ে নেবে ভেবে নোটটা সে বাড়িযে দিযেছিল, দেখে জযধ্বনি করে উঠেছিল ছেলেরা। মনের চাপা আগুন কিন্তু তার দিন চালানর চিন্তা, দশটা টাকার প্রণাস্তকর মাযা ভুলিযে দিতে পারে নি—জীবনে হয় ত সেই প্রথম ও একমাত্র জয়ধ্বনিকেও সে দশটাকাব একটা নোট দিযে কিনতে পাবে নি। মাথা হেঁট করে জানিয়েছিল যে পুরো নোটটা সে দেয নি, অন্ততঃ ন'টা টাকা তার ফেরত চাই!

তখন সে ছাত্র, চরকা মানে, খদ্দর পরে। আদর্শের চেয়েও জগতে বড় কিছু থাকতে পারে, বাস্তব অবস্থার ফেরে পড়া কোন একটা মানুষেব দশটা টাকার মাযা ছাপিয়ে উঠতে পারে মনের চাপা আগুণকে, তখন একথা ভাবতেও গা তার লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠত। লেখককে সে অভিশাপ দিযেছিল। স্বাধীনতার অভিযান চলছে, সারা দেশে বিরাট ব্যাপক আন্দোলন, শোভাযাত্রা আর ছেলেদের জয়ধ্বনি করে ওঠার মত নাটকীয় অবস্থায় সাময়িক একটা ঝোঁকও চাপল না কেরানীটির যে যাক্ যাক্, দেশের জন্য যাক্ আমার দশ টাকার নোটটা? গুনে গেঁথে সে ফিরিয়ে নিল ভাঙ্গানি টাকা! দুঃখ-দুর্দ্দশার, অভাব-অনটনের, বাস্তবতার নামে কি কুৎসিৎ অপপ্রচার—মানুষের হৃদযাবেগের চেয়ে টাকাকে বড় করা!

আজ সেও দশ টাকার একটা নোট নিয়েই সকালবেলা বাড়ি থেকে

বেরিয়ে চালের চোরাবাজার হয়ে মাছ-তরকারীর চোরাবাজারে এসেছে। আজ আর দশটা টাকার নোটে কেরানীর দেশপ্রেমকে ঘায়েল করার জন্য পনের বছরের পুরানো সেই গল্পের লেখককে গাল দিতে সাধ যায় না। কি যেন চাপা ছিল সেই ত্যাগের মন্ত্রে গড়ে তোলা দেশপ্রেমের মধ্যে, একটা মস্ত মিথ্যা বিরাট ফাঁকি ; যার ফলে ভাবের ঘরের আবেগের বন্যা মাটির পৃথিবীতে নামলেই শুকিয়ে যেত। যারা ফেনিয়ে তুলত সে আবেগ, অপবিত্র মাটির পৃথিবীর বাস্তব মানুষ তাকে অশুদ্ধ প্রাণের জ্বালায় বদলে নিয়ে বুদ্ধ চৈতন্যের তুচ্ছ ত্যাগের চেয়ে ঢের বড় ত্যাগ ঘর-সংসার সুখ-শান্তির সঙ্গে জীবনটা পর্যন্ত দান করতে মেতে উঠলে তারাই রাশ টেনে ধরত—আকাশে ছড়ান মহান বাষ্পরাশির মোহ কাটিয়ে জীবনের বিরাট ইঞ্জিন প্রাণের আগুনে কঠিন প্রতিজ্ঞার ইস্পাতে আটক নিজের বাষ্পেই দুর্দান্ত চাপ সৃষ্টি করে চাকা ঘুরিয়ে চলতে আরম্ভ করলেই ওই ফাঁকির সেফ্‌টি ভালভ্‌ খুলে হুস্‌ করে বার করে দেওয়া হত শক্তির চাপ, অনড় নিশ্চল হয়ে যেত গতি। শোভাযাত্রার ছেলেরা জয়ধ্বনি করে উঠলেও কেন সেই কেরানী ফিরিয়ে নেবেনা ভাঙ্গানি? তার দেশপ্রেমের জগতের সঙ্গে ত যোগ ছিল না তার ওই দশটা টাকায় বাকী মাস সংসার চালাবার জগতটার! এ জগতের ত্যাগ সে কি করে পৌঁছে দেবে আরেক জগতে, কি করে সে ভাববে যে দেশের জন্য ত্যাগ করার সঙ্গে তার অচলপ্রায় কষ্টকর জীবনযাত্রা চালু হবার যোগ আছে?

বাজারে ভাপসা বাতাসে পচা মাছের গন্ধ। পচা মাছ চালানও আসে বাজারে, বিক্রীও হয়ে যায়। দাম একটু সস্তা। তার দেশপ্রেম থেকে কি এমনি পচা গন্ধ পায় নলিনী?

পথান্তর

অতুলের মনে হয়, সে স্বপ্ন। অথবা সিনেমার সস্তা ঘটনা সত্যই অভিনীত হচ্ছে তার জীবনে? নইলে এমন উদ্ভট, অবান্তর, অর্থহীন অবস্থা কখনো মানুষের জীবনে সৃষ্টি হয়? বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বন্যা-পীড়িতদের সেবা করতে এসেছে এটা অসাধারণ কিছু নয়, আদর্শ নিয়ে বাপের সঙ্গে কত ছেলেই কলহ করে। কিন্তু টিলায় বসে কর্তব্য সম্বন্ধে রাসমণি আর রাখহরির সঙ্গে পরামর্শ করতে করতে নিশান দেখিয়ে সতর্ক করছে নৌকার মাঝিদের কোনদিকে ঘূর্ণাবর্তের বিপদ আর ঠিক সেই সময় তার নিজের বাপের বজরা ভেসে আসছে সেই ঘূর্ণাবর্তের দিকে!

রাখহরি অস্বীকার করছে নিশান দেখিয়ে বজরার মাঝিকে সতর্ক করতে! ঘূর্ণাবর্তে পড়ে বজরা মারা যাক।

রাসমণি জোর দিয়ে বলে, 'রাখহরি, তুমি বুঝতে পারছ না। একটা রাঘব চৌধুরীকে মেরে আমাদের কি হবে? ওর যায়গায় আরেকজন রাঘব চৌধুরী আসবে। তুমি নিশান দেখাও!'

রাখহরি তবু ইতস্ততঃ করে। এ যুক্তি সে বোঝে না। তারা তো মারছে না রাঘব চৌধুরীকে। মরতে চলেছে সে নিজেই। তারা শুধু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না। কেন করবে?

বজরা এগিয়ে আসে। আর সময় বড় বেশী নেই। আরেকটু দেরী হলে ঘূর্ণীর কবল থেকে বজরটাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।

অতুল শান্তকণ্ঠে বলে, 'তাছাড়া, রাখহরি, একটা কথা ভেবে ত্থাখো। বজরার মাঝি-মল্লারা কি দোষ করেছে, রাঘব চৌধুরীর জন্য ওদের

কেন প্রাণ যাবে? একজনের জন্ত এতগুলি নির্দোষী মানুষকে তুমি মরতে দেবে?'

রাখহরি ঠোঁট কামড়ায়।

অতুল আবার বলে ওরা চৌধুরীর হুকুমে চলে। কিন্তু, চাকরী ওরা করে পেটের দায়ে।

রাখহরি তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলে নিশান তুলে ধরে। কিন্তু নিশান দেখাবার প্রয়োজন তখন এমন জরুরী যে গলা ছেড়ে হাঁকও সে দেয়। কথা না বুঝলেও আওয়াজটা বোধহয় বজরার লোকের কাণে পৌছায়।

বজরার মুখ ধীরে ধীরে ঘুরছে দেখা যায়। ঘূর্ণির স্রোতের টানে গিয়ে পড়বার আগেই দিক পরিবর্তন করে টিলার খানিক তফাৎ দিয়ে রাঘব চৌধুরীর বজরা চলে যায়।

রাসমণি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অতুল নির্বিকার ভাবে নিজেই রাখহরির কলকেতে একটু তামাক দিয়ে নারকেল ছোবড়ার আগুণ জ্বালিয়ে নেয়। একটা পাতা গোল করে পাকিয়ে নলের মত করে নিয়ে একটা মুখ কলকের তলায় লাগিয়ে আরেকটা মুখ দিয়ে তামাক টানে। হাতে কলকে ধরে টান দেবার কায়দাটা সে এখনো ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি।

কতকটা নিজের মনেই বলে, 'বজরাটা সদরে যাচ্ছে।'

রাসমণি প্রশ্ন করে, 'কি করে জানলেন?'

রাখহরি তার জবাব শুনবার জন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অতুল বলে, 'আমি জানি। সদরের কোর্টে ওঁর জরুরী দরকার আছে। ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন।'

রাখহরি বলে, 'এত খপর কোথা পেলেন আপনি?'

অতুল বলে, 'তোমাদের কাছে আর গোপন করবো না, আমিই রাঘব চৌধুরীর ছেলে।'

রাধহরি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে অতুলের মুখের দিকে। কিন্তু রাসমণি বিশেষ আশ্চর্য্য হয়েছে মনে হয় না। বরং অতুলের এই সহজ স্বীকারোক্তিতে তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি দেখা দেয়। সে বলে, 'আমি জানতাম। আপনাকে দেখেই চিনেছিলাম।'

'বলেন নি কেন?'

'আমার কি গরজ? আপনার কোন খারাপ মতলব আছে টের পেলে অবশ্য ফাঁস করে দিতাম কিন্তু আপনি যদি পরিচয় ভাঁড়িয়ে এদের ভাল করতে চান সে আপনার বিবেচনা। আমার কি বলার ছিল? আমি ভেবেছিলাম, রাঘব চৌধুরীর ছেলে বলে পরিচয় দিতে আপনার বোধ হয় লজ্জা হচ্ছে।'

'আপনি কেন বাপ তুলে গাল দিলেন।'

'দিলাম কি?'

'দিলেন বৈকি। আমি কার ছেলে তাতে আমার লজ্জা বা গৌরবের কি আছে? বাপের পরিচয়ে তো আমার পরিচয় নয়। আমি কি, আমার পরিচয় হল তাই।'

'বাপের ধারা তো মানুষ পায়।'

'পায় বৈকি। আমি যে বাপের গো'ট' পেয়েছি তাতো দেখতেই পাচ্ছেন। বাপের কাছে মানুষ হলে অন্য ধারাগুলিও হয়তো পেতাম। কিন্তু আমায় মানুষ করেছে অন্য লোকে, আমি মিলেছি অন্য জগতের অন্য জাতের মানুষের সঙ্গে। পরিবেশের ধারা মানুষ বেশী পায় সেটা ভুলছেন কেন?'

রাসমণি হেসে বলে, 'ভুলিনি। ভোলার জো আছে কি?

অতুল কলকেটা এগিয়ে দেয়, রাখহরি কিন্তু হাত বাড়ায় না। মুখে একটা অদ্ভুত ভাব এনে সে এতক্ষণ চুপচাপ দু'জনের কথা শুনছিল, এবার ঝাঁঝালো গলায় বলে, 'রাঘব চৌধুরীর ছেলে আপনি? মোদের সাথে আপনি কেন বাবু?'

'আমি তোমাদেরি একজন।'

'রাঘব চৌধুরীর ছেলে মোদেরই একজন! পশ্চিমে সূর্য্য উঠবে তা'হলে। নৌকা আসছে, আপনি যান বাবু চলে। আপনাকে মোদের দরকার নেই।'

রাসমণি তাকে ধমক দিয়ে বলে, 'রাখো, তুমি যেমন গোঁয়ার, তেমনি বোকা। শুনলে না রাঘব চৌধুরী ওঁকে ত্যাজ্যপুত্র করতে গেছে? জাননা, তোমাদের দলে ভেড়ায়, ওর বাপের এত রাগ? বুঝে কথা বল, বুঝে কাজ কর।'

রাখহরি মুখ বাঁকিয়ে হাসে। 'ত্যাজ্যপুত্তুর করল তো কি? আজ ত্যাজ্যপুত্তুর করল কাল ঘরে টেনে নেবে!' বলে খানিক তফাতে সরে পেছন ফিরে বসে রাখহরি আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকে।

অতুল রাসমণিকে বলে, 'থাক, আর কিছু বলবেন না ওকে। ওদের সন্দেহ আর অবিশ্বাস হবে, কথায় তা যাবে না। ওদের চিড়ে অত সহজ কথায় ভেজে না।'

'এদের খানিকটা চেনেন দেখছি।'

একে একে তিন চারটি নৌকা এসে টিলার গায়ে লাগে। এরা চারিদিকের খবর নিয়ে আসছে, কোথায় বন্যার প্রকোপ কি রকম। কয়েকটি গ্রামের খবর এরা দেয়, যেখানে জল কম হয়েছে আর চারিদিক থেকে দুঃস্থ নরনারী ও গৃহপালিত পশুরা যেখানে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে। বন্যার কবল থেকে তারা বেঁচেছে কিন্তু আশ্রয় পাচ্ছে না।

এসব গ্রামের অধিবাসীদের অবস্থাও সুবিধে নয়, ভবিষ্যতে কি হবে কেউ ভেবে পাচ্ছে না, নিজেরা কি করে বেঁচে থাকবে সেই ভাবনাতেই তারা ব্যাকুল, অন্যকে আশ্রয় দিতে কেউ ভরসা পাচ্ছে না। পীরপুর বড় গ্রাম। বন্যায় পীরপুরের ক্ষতি হয়েছে সব চেয়ে কম, বাইরে থেকে লোকও সেখানে এসেছে বহু। তাদের খাওয়া জুটছে না, অনেকে অসুখে ভুগছে।

অতুল জিজ্ঞেস করে, 'পীরপুর যেতে কতক্ষণ লাগবে রাসুল।'

'ঘণ্টা তিনেক।

'তাহলে আমরা পীরপুরে প্রথম গিয়ে কাজ আরম্ভ করি। আপনি কি বলেন? তুমি কি বল রাখহরি?'

রাখহরি শুধু চোখ তুলে তাকায়, কথা বলে না।

রাসমণি বলে, 'তাই চলুন।' রাখহরি কোন কথা বলে না কিন্তু তাদের সঙ্গে রাসুলের নৌকায় গিয়ে ওঠে।

নৌকায় যেতে যেতে বন্যা-পীড়িত গ্রাম দেখা যায় কাছে ও দূরে। কত ঘর ভেঙ্গে পড়ছে, ভেসে গিয়েছে, যে ঘর গুলি দাঁড়িয়ে আছে তার চালায়, গাছের ডালে আর মাচায় আশ্রয় নিয়েছে নিরাশ্রয় মানুষ এদের জন্যও ব্যবস্থা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। কিন্তু এখন অবিলম্বে কিছু করবার ক্ষমতা তাদের নেই। পীরপুরে সুরু করতে হবে। সদরে গিয়ে রিলিফের আন্দোলন ও ব্যবস্থা সুরু করতে হবে। সম্ভব হলে পীরপুরে কেন্দ্র করে সেখান থেকে চারিদিকে এসব গ্রামে সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। নয় তো কাছাকাছি সুবিধামত অন্য কোথাও কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। নৌকার ধারে বসে ঘোলা জলের স্রোতের দিকে চেয়ে অতুল স্তব্ধ হয়ে বসে এইসব কথা ভাবে, রাসমণি মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। মৃতদেহ

ভেসে যায় নৌকার পাশ দিয়ে, মানুষের, গরুছাগলের, কুকুরের। দেখে রাসমণি শিউরে ওঠে, কিন্তু অতুলের মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। সে জানে এদেশে মরণ কত সস্তা।

পীরপুরে পৌছে দেখা যায়, রসুলদের কাছে যে বর্ণনা শোনা গিয়েছিল, অবস্থা তার চেয়ে গুরুতর। প্রায় হাজার খানেক নিরাশ্রয় লোক এখানে এসে জড়ো হয়েছে, হাটের চালা, গোয়ালঘর, গাছতলা মাটির পথের বাঁধ, যে যেখানে পেয়েছে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের বেশীর ভাগের মাথার ওপরেই খোলা আকাশ, অধিকাংশই উপবাসী। গাঁয়ের লোক কিছু কিছু চাল ডাল দিয়েছে কিন্তু তা যৎসামান্য। তাদের নিজেদের সঞ্চয় নেই, তারা কোথা থেকে দেবে ?

ঘুরে ঘুরে অতুল চারিদিকের অবস্থা দেখে বেড়ায়, লোকজনের সংগে কথা বলে। লোকে কিন্তু তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। পীরপুরে সে পা দেবার অল্পক্ষণের মধ্যেই কি করে চারিদিকে খবর ছড়িয়ে গেছে যে রাঘব চৌধুরীর ছেলে এসেছে গাঁয়ে। এমনি নামের মহিমা রাঘব চৌধুরীর যে খবর শুনেই সবাই রীতিমত ভড়কে গেছে।

রাসমণি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, 'এর চেয়ে গোপন রাখলেই পারতেন পরিচয়টা।'

কপালের ঘাম মুছে অতুল শান্ত, প্রায় সস্নেহ কণ্ঠে বলে 'ভাবছেন কেন ? সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লোকের কাছে তার অনাদরে রাসমণির ক্ষোভটা তার বড় ভাল লাগে। তার শ্রান্ত কোমল মুখ দিয়ে কেমন একটা মায়াও সে বোধ করে। কিন্তু একটু বিশ্রাম করে নিতে বলার ইচ্ছাটা মনের ওপর চোখ রাঙিয়ে দমন করে ফেলে।

জিজ্ঞাসা করে করে জানা যায় যে গাঁয়ের একজনের কাছে মরাই ভরা প্রচুর ধান আছে, তার নাম যোগেন সাউ। পীরপুরের সে ইজারা ভোগ করে রাঘব চৌধুরীর কাছ থেকে।

অতুল বলে, 'ওর মরায়ের ধানগুলিই তবে বার করতে হবে।'

'ধান ও দেবে না বাবু।'

'এমনি না দিক,বেচবে তো।'

'একমুঠো ধানও বেচবে না।'

'দেখাই যাক বেচে কিনা। ওর মরাই ভরা ধান থাকবে আর এতগুলো লোক না খেয়ে মরবে, তা তো হয় না।'

বাসমণি জিজ্ঞেস করে, 'কি করবেন?'

'চলো না যাই।'

বাসমণি চকিতে তার দিকে তাকায়। কিন্তু অতুলের মুখ দেখে বোঝা যায় তাকে যে এই প্রথমবার সে তুমি বলেছে এটা তার খেয়াল আছে।

যোগেন সাউএর কাছে সে ধান যোগাড় করতে যাচ্ছে শুনে অনেক লোক তার পিছু নেয়, কিন্তু সংগে না গিয়ে একটু তফাতে থাকে। যোগেন সাউ কম ধড়িবাজ সয়তান লোক নয়।

যোগেন সাউ লোকটা বেঁটে, মোটা, গায়ে শ্বেতির ছাড়া ছাড়া দাগ, মাথায় টাক। বয়স প্রায় চল্লিশ। অতুলের পরিচয় পেয়েও উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জানাবার কোন লক্ষণ তার দেখা যায় না। সবিনয়ে শুধু বলে, 'চৌধুরী মশায়ের ছেলে আপনি? বেশ, বেশ।'

অতুলের প্রস্তাব শুনে সে বলে, 'ধান কিনে নেবেন? তা ধানের দামটা কে দেবে?'

'আমি দেব।'

'আপনি দেবেন ?'

'দেব। আমার যা কিছু আছে সব এদের জন্য দিয়ে দেব। আপনার ধানের দাম হিসাব করে খত লিখে দিচ্ছি, সাত দিনের মধ্যে টাকা পাবেন।'

যোগেন সাউ একটু ভড়কে যায়। এ বন্যার সুযোগে ধানের দর সে হাউই-এর মত আকাশের কোথায় চড়িয়ে দিতে পারবে সেই কথাটাই সে ভাবছিল, এর কাছে সে দর নেওয়া যাবে না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে 'যাক্‌গে ছোটবাবু, ওসব হাংগামা আমি জানি না। তা ছাড়া, ধান আমি বেচবো না।'

'ধান আপনাকে বেচতেই হবে।'

'বটে ? আমার ধান—'

'এতগুলো প্রাণ যে ধানে বাঁচবে, সে ধান আপনার নয়। ধানের ন্যায্য দামটা আপনার হতে পারে বটে, যদিও তাও হওয়া উচিত নয়। ন্যায্য দাম পাবেন, ধান ছেড়ে দিন। কথা বাড়াবেন না।'

'ন্যায্য দামটা কত ?'

'বন্যার আগে খোলা বাজারে যে দাম ছিল।'

'আমি দেব না। একি জবরদস্তি নাকি ?'

'জবরদস্তি নয়, ন্যায় বিচার। ধান আপনি দেবেন, ধান আমরা নেব, নিতেই হবে আমাদের—এর জন্য কেন মিছে জোর জবরদস্তি করছেন ?'

মুখ ফিরিয়ে অতুল রাখহরিকে বলে, 'ওদের ডাকো তো রাখহরি, ধান বার করে মাপুক। ভয় নেই সাউমশায়, আমি নিজে দাঁড়িয়ে মাপাব, এদিক ওদিক হবে না।'

যোগেন সাউ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ ফিরিয়ে অতুল দেখতে পায়, রাসমনি সজল চোখে তার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু রাখহরি? সবাই তার ত্যাগে উদারতায় মহত্বে মুগ্ধ হয়েছে, রাখহরি কি এখনো তাকে বিশ্বাস করবে না? তার নির্ব্বাক উদাসীন ভাব ঘুচবে না?

তখন ধান মাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, রাখহরি হঠাৎ বলে, 'মোর একটা ভুল হয়েছিল ছোটবাবু।'

অতুল তৎক্ষণাৎ খুসী হয়ে প্রত্যাশার সুরে বলে, 'কি ভুল রাখহরি?'

রাখহরি বলে, 'এসব রিলিফটিলিফের কাজ তোমরা বাবুরা ভাল পার, এটা খেয়াল ছিল না বটে। তোমাদের এ সব কিছু দোষের নয় কো মোটে।'

সিদ্ধপুরুষ

সেদিন বিজয়া দশমী। সকালে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে নিখিল প্রায় সাড়ে এগারটার সময় চাপরাশী কানুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। সে যাবে হালিযায় অজিতদের বাড়ী। হালিযা মাইল পাঁচ-ছয় দূর হবে সহর থেকে, কিছু পথ নৌকায় গিয়ে বাকীটা হাঁটতে হবে।

পূর্ববাংলায় এই মহকুমা সহরে নিখিলেরা এসেছে অল্পদিন। তার বাবা সহরের বড়দরের হাকিম। তালুকদার শশাঙ্ক চক্রবর্ত্তীর ছেলে অজিতের সঙ্গে ইতিমধ্যেই কি করে যেন খুব ভাব হয়ে গেছে নিখিলের! এক ক্লাশে পড়ে অবশ্য তারা, কিন্তু তাতেই কি ভাব হয়? সম্ভবত দুপক্ষের কৌতূহল। অজিতের বাবা বেশ বড়লোকও বটে কিন্তু একেবারে সেকেলে গেঁয়ো বড়লোক। হালিয়া গ্রামে টিন আর খড়ের সেকেলে

বাড়ীতে একগাদা আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে বাস করে, এত কাছে সহরে এসে একটা দালান তুলে একা থাকবে এটুকু সখও নেই। অজিতের বেশভূষা চাল চলনও গেঁয়ো গেঁয়ো। আজকাল স্মার্ট হবার কিছু কিছু চেষ্টা সে আরম্ভ করেছে বটে কিন্তু সে চেষ্টা পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে কেমন গেঁয়ো ধাঁচের।

তাই, নিখিলের মত ধোপদুরস্ত ছেলে এমন গলায় গলায় ভাব করবে তার সঙ্গে এটা একটু খাপছাড়া মনে হয়েছে অনেকের।

অজিতদের গাঁয়ের বাড়ীতে প্রতিবছর খুব সমারোহের সঙ্গে পূজা হয়, এবার বিশেষ বন্ধু নিখিলকে সে বিশেষভাবে নেমন্তন্ন করেছে তাদের ওখানে যাবার জন্য। বন্ধুর নেমন্তন্ন রাখতেই নিখিল আজ রওনা হয়েছে, আজকের দিনটা ওখানেই থাকবে।

অজিত তাকে একেবারে পূজোর কয়েকটা দিন তাদের ওখানে কি ভাবে কাটে তার বিবরণ শুনিয়ে রেখেছে, নিখিলের আশা হয়েছিল এবার নতুন রকমের হৈচৈ করে পূজোটা কাটবে। চাররাত্রি যাত্রা, মহিষ বলি, ঢুলির নাচের লড়াই, মেলা এসব উপভোগ করবে নিখিল, কোন দিন চোখেও দেখেনি এমন সব নতুন নতুন জিনিষ খেয়ে দেখবে এদেশের। তার কোন অসুবিধা হবে না, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে অজিত।

নিখিল খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার এ উৎসাহে বাড়ীর মানুষ গোড়ায় একেবারেই সায় দিতে চায় নি। বাংলাদেশের রোগে-ভরা অস্বাস্থ্যকর গাঁ, চারিদিকে জলকাদা, গেঁয়োলোকের বাড়ীতে থাকা খাওয়ার নোংরা ব্যবস্থা, তাতে আবার লোক গিজ গিজ করবে পূজো উপলক্ষে। এর মধ্যে ছেলে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে দিয়ে আসতে চায় শুনেই তারা সভয়ে ও সজোরে মাথা নেড়েছিল।

মাটির মাশুল

অনেক লড়াই করে মাত্র কাল নিখিল তাদের অনুমতি আদায় করেছে যে শুধু আজকের রাতটা সে হালিয়ায় কাটাতে পারবে। তাও মন্দের ভালো। মেলা আর ঢুলির লড়াইটা দেখতে পাবে। রাত্রে যাত্রাও আছে।

নদী থই থই করছে জলে। ঘণ্টা তিনেক চলে নৌকা এক গাছপালাভরা গাঁয়ের কাছে ভিড়ল। আরও কয়েকটি নৌকা সেখানে বাঁধা ছিল।

তীরে নেমে নিখিল জিজ্ঞেস করল চাপরাশীকে, হালিয়া কতদূর এখান থেকে?

চাপরাশী সোৎসাহে বলল, এই তো হালিয়া, দেখা যাচ্ছে।

মাঝিরাও সায় দিল সমস্বরে যে হালিয়া গ্রাম কাছেই, ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত দেখা যায় গাছপালার ফাঁকে!

পূরো আধঘণ্টা হেঁটেও কিন্তু হালিয়া পাওয়া যায় না। চাপরাশী আবার বলে, ওই তো হালিয়া বাবু!

কি আর করা যাবে। চাপরাশীর গালে অবশ্য নিখিল একটা চড় কষিয়ে দেয়, কিন্তু কিল চড় খাবার অভ্যাস চাপরাশীর আছে। তাতে হালিয়া তো হালিয়া হবে না। আবার সে পা চালায় হালিয়ার উদ্দেশে।

নৌকো থেকে নামতেই চারটে বেজেছিল। হালিয়া পৌছুতে সন্ধ্যা হবে সন্দেহ নেই। চলতে চলতে পা'টা সুড়সুড় করে নিখিলের সামনের চাপরাশীকে বলের মত একটিবার স্যুট করার জন্য। নরম নরম কাদা কাদা মেটে পথ। সবে কিছুদিন গাঁয়ের পথ-ঘাট জলের তলা থেকে মাথা তুলেছে। অধিকাংশ মাঠ ক্ষেত এখনো জলময়। ছোট ছোট

গাঁ পড়ছে পথে। বিসর্জ্জনের বাজনা কানে আসছে কাছ ও দূর থেকে।

সন্ধ্যার পর নিখিল অজিতদের বাড়ী পৌছল। পা দুটো তখন তার বেশ টন টন করছে। দু'তিন মাইল রাস্তা কি করে পাকা ছ'সাত মাইলের মত দীর্ঘ হয় ভেবে মেজাজটা আরও বেশী বিগড়ে গেছে। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড।

তখন প্রতিমা বার করার আয়োজন চলছে। সকলেই ব্যতিব্যস্ত। নিখিলকে দেখে খুসী হয়ে অজিত বলল, ভাসান দেখতে যাবি প্রতিমার সঙ্গে?

সেই নদীতে?

অজিত হাসল। এ অঞ্চলের প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হয় কাছেই কালোদীঘি নামে একটা মস্ত বিলে, নদী পর্য্যন্ত প্রতিমা যায় না। বিলের ধারেই মেলা বসে। বিসর্জ্জনের পর সব ঢুলিরা সেখানে নাচের লড়াই দেখায়।

যাবো। একটু জিরিয়ে নিই।

একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে বসিয়ে অজিত চলে যায়। তার বসবার সময় নেই। অতিথিকে কিছু খেতে দেবার কথাও সে বলে না। এখন কিছু খেতে নেই। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর ফিরে এলে তখন কোলাকুলি আর খাবার ব্যবস্থা।

ঘরের অর্দ্ধেক জুড়ে নীচু কাঠের চৌকিতে মস্ত ফরাস বিছানো। ফরাসের মাঝখানে ছোট কাঠের টুলে একটা লণ্ঠন, উপরে চালা থেকে আরেকটা বাতি ঝুলছে। তার নীচে প্রকাণ্ড একটা পিতলের হাঁড়িতে কাঠের একটা দণ্ড দিয়ে একজন চাকর সবুজ রঙের কি ঘুঁটছিল। ঘরে আর লোকজন কেউ নেই।

মাটির মাশুল

ওটা কি ?

আজ্ঞে, সরবৎ।

কিসের সববৎ ?

চাকর বোকার মত একটু হাসল। একটু পরেই সরবৎ ঘেঁটা বন্ধ করে ঘরের কোনে হাঁড়িটা রেখে একটা থালা দিযে ঢেকে আরেকবার নিখিলেব দিকে চেযে আরেকটু হেসে সে ঘর থেকে চলে গেল।

বাদাম পেস্তা দিয়ে বানানো সরবৎ নিশ্চয। কি গাঢ় সবুজ রং! খেতে কেমন লাগবে কে জানে। পুষ্টিকর যে হবে তাতে সন্দেহ নাই। এক গ্লাস চেযে নিযে খেলে হত।

মণ্ডপে প্রচণ্ড শব্দে ঢাক ঢোল কাঁসি ঘণ্টা বাজছে, লোকজন গলা ফাটিযে চেঁচামেচি করছে। বড়ই শ্রান্তি বোধ কবে নিখিল। ক্ষুধাতৃষ্ণা নাড়া দিযে দিযে ওঠে ভেতবে। তৃষ্ণাটা এখন যেন বেশী জোবালো হযেছে। ঘবের বেড়া ঘেঁসে একটি কুঁজো বসান ছিল, গলায উপুড় করা একটি কাঁচের গ্লাস। গ্লাসে জল খাওযা যায।

সরবতও খাওয়া যায।

এক হাঁড়ি সরবত থাকতে জল কেন খাবে ? গাঢ় সবুজ পেস্তা বাদামের খাসা সরবৎ। বন্ধুর বাড়ীতে না বলে একটু সরবত খেলে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ হবে না নিশ্চয !

কাঠের দণ্ডটা সরবতের হাঁড়ির মুখে চাপান থালাটাব উপরেই ছিল। সববতটা একবার ভাল করে ঘুঁটে সে গেলাস ভর্তি করে নেয়। গেলাসে চুমুক দিয়েই মনটা তার খুসীতে ভরে উঠে। সুন্দর স্বাদ সরবতের, চমৎকার গন্ধ। এমন সরবৎ জীবনে নিখিল কখনো চোখে ছাখে নি। বেশ একটু ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি ক্ষীর ক্ষীর মেওয়া মেওয়া

-খেতে, গলা দিয়ে নামবার পরেও যেন স্বাদটা জানান দিতে থাকে। তেজী সরবৎ!

গেলাস খালি করে নিখিল বলে, আঃ!

সে আরেক গ্লাস সরবৎ খায়।

খিদে আর তেষ্টা দুই মেটে সঙ্গে সঙ্গে, শ্রান্তি ক্লান্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে যায় শরীর মন দুয়েরই। বেশ তাজা মনে হতে থাকে নিজেকে, মনটা ভরে উঠতে থাকে জীবন্ত খুসীর ভাবে। পৌছুতে একটু দেরী হয়েছে বলে, পথ একটু বেশী হাঁটতে হয়েছে বলে, পূজার আমোদটা যেন তার মাটি হয়ে গেল ভাবছিল সে! কথাটা মনে করে নিখিল মুচকে হাসে।

আরকটু সরবৎ ঢেলে নিয়ে সে খায়। বেশী নয়, আধ গেলাস।

আলো বেশী উজ্জ্বল হয়েছে ঘরের। লণ্ঠনের লালচে আলোয় এমন আশ্চর্য্য চাকচিক্য থাকে নিখিল জানত না। খুব হাল্কা লাগছে শরীরটা। হুঁঃ, মা আবার বলে দিন দিন সে রোগা হয়ে যাচ্ছে, মা কি জানবে তার গায়ে কত জোর!

বাড়ীর কথা ভেবে তার হাসি পায়। কি মজাটাই আজ সে করল! ওরা সকলে সেজেগুজে মোটরে চেপে নদীর ধারে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখতে যাবে, ওরা কি কল্পনা করতে পারবে সে কোথায় আছে, কি করছে! ঢোলের বাজনার সঙ্গে সে আজ খুব এক চোট নেচে নেবে, প্রতিমার আগে সবাইকে যেমন নেচে যেতে দেখেছে চিরকাল, কিন্তু নিজে কোনদিন নাচেনি।

মাথার মধ্যে কেমন কেমন করছে কেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কেমন কেমন করাটাও যে ঠিক কি রকমের সে ধারণা করতে পারে না। মাথার মধ্যে যা কিছু আছে, সেগুলো কি কে জানে, সব

যেন একবার সরু আর একবার মোটা হচ্ছে, তারপরেই চ্যাপ্টা হয়ে পাটি গুটোনোর মত গুটিয়ে যাচ্ছে নিজে নিজেই। বেশী ফুর্তি হলে বোধ হয় এরকম হয়। হয়তো হয়, বয়ে গেল নিখিলের! এত সব হাস্যকর ব্যাপারের মধ্যে আরেকটা হাস্যকর ব্যাপার নয় ঘটলই তার মাথার মধ্যে!

ভেবে, এমন হাসি পায় নিখিলের যে শূন্য ঘরে আপন মনে হাসতে হাসতে সে বেদম হয়ে পড়ে।

হাসি থামে হঠাৎ। সামনে ঘরের শাল কাঠের খুঁটিটাকে এদিক ওদিক দুলতে দেখে। চোখ পাকিয়ে সে খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যেন কত ভাল মানুষ এমনিভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে খুঁটিটা, একটু নড়ে না পর্য্যন্ত। কিন্তু এদিকে সেই অবসরে মেঝেটা বেশ দুলতে আরম্ভ করে দেয় তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে।

এমন সময় ঘরে আসে অজিত। বলে, ইস, বড় দেরী হয়ে গেল প্রতিমা বার করতে। হাঙ্গামার আর শেষ নেই। যাবি না প্রতিমার সঙ্গে?

যাব না, একশোবার যাব! যাব বলে যাব, একদম—

উৎসাহের আতিশয্যে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে নিখিল। অজিত তার মুখের দিকে চেয়ে ভড়কে গিয়ে বলে, কি হয়েছে তোর?

কি হবে? কিস্সু না।

অমন করছিস যে?

নাচ শিখছি। ঠাকুরের সঙ্গে নাচব না? দাঁড়া একটু সরবৎ খেয়েনি।

মাটির মাশুল

গেলাস নিয়ে নিখিল খানিকটা সরবৎ ঢালে হাঁড়ি থেকে, অর্দ্ধেকটা পড়ে মাটিতে অর্দ্ধেকটা গেলাসে।

খাবার সময় কস বেয়ে সরবৎ পড়ে, বুকের কাছে জামা ভিজে যায়।

অজিতের চোখ হয় বড় বড়।

কতটা সরবৎ খেয়েছিস নিখিল?

কত আর, দু'তিন গ্লাস।

দু'তিন গ্লাস! কি সর্ব্বনাশ! ও যে সিদ্ধির সরবৎ জানিস না?

জানি না? আমার সামনে বানালো, আমি জানি না?

সিদ্ধি খাস তো তুই?

নিখিল জীবনে কখনো সিদ্ধি খায়নি। কিন্তু সে হল আলাদা কথা। কে একজন একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে কথার পিঠে কথা চাপিয়ে তাকে জবাব দিতে হবে, বাস। কিসের মানে কি তা নিয়ে কে মাথা ঘামায়!

কত খেয়েছি!—সে বলে অবজ্ঞার সঙ্গে।

শুনে অজিত একটু নিশ্চিন্ত হয়। বলে, এ কিন্তু দেশী বুনো সিদ্ধি। এদিকে যেখানে সেখানে সিদ্ধি গাছ হয় দেখেছিস তো? এ সেই সিদ্ধি, ভীষণ তেজ, আর খাসনা কিন্তু।

নিখিলকে একটু চোখে চোখেই রাখে অজিত। কিন্তু কালো দীঘির কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ তাকে আর সে দেখতে পায় না। প্রতিমা নিয়ে সবাই তখন ব্যস্ত, অজিত নিজেও এদিক ওদিক তার খোঁজে একটু চোখ বুলিয়ে প্রতিমার সঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। বিসর্জ্জনের পর খোঁজ করা হয় ভাল ভাবে। কিন্তু কোথাও নিখিলের পাত্তাও মেলে না।

অজিত ভয় পেয়ে ভাবে, সেরেছে!

মাটির মাশুল

নিখিল যখন চোখ মেলে তাকায়, বেশ বেলা হয়েছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে বুঝে উঠতে পারে না, সত্য সত্যই জেগেছে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। ভাঙ্গাচোরা এই কুঁড়েঘরের মধ্যে সে কি করে এল, সেঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে বিছানো চাটাইয়ে ময়লা দুর্গন্ধ এই ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে কখন শুল? দরজার ঝাঁপ খোলা, বাইরে উঠানে গামছা পরা কালো একটি লোক বাঁশের মাচায় কল্কি সাজাচ্ছে। এ তো অজিতের বাড়ী নয়!

উঠে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হয় গায়ে বুঝি একটুও জোর নেই। অনেকদিন যেন অসুখে ভুগছে এমনি বিশ্রী দুর্ব্বল লাগছে শরীরটা, মাথার মধ্যে টনটন করছে। বাইরেও কি যেন জোরে সেঁটে আছে মাথার সঙ্গে। মাথায় হাত দিয়ে নিখিল চুল খুঁজে পায় না, মাটির মত শক্ত কি যেন হাতে ঠেকে।

ভাবতে ভাবতে অজিতদের বাড়ীতে গিয়ে খালি ঘরে বসে সবুজ রঙের সরবৎ খাওয়া পর্য্যন্ত মনে পড়ে নিখিলের, তারপরের আর কোনো কথাই মনে আসে না। সব ফাঁকা হয়ে থাকে।

পিঁ পিঁ আওয়াজ করে নিখিল উঠানের লোকটিকে ডাকে। লোকটি ঘরে এসে খুসীতে একগাল হেসে বলে, জেগেছ বাবু!

তুমি কে? এটা কার বাড়ী? আমি এখানে এলাম কি করে?

তাকে কথা বলতে দেখে লোকটি যেন আরও খুসী হয়ে বলে, মাথা ভাল হয়ে গেছে বাবু?

মাটির মাশুল

নাম তার শিবু। গরীব চাষী। দশমীর রাত্রে মেলা থেকে ফেরবার সময় রাস্তায় তাকে পাগলামী করতে দেখে সাথে করে বাড়ী নিয়ে এসেছে। তাদের গাঁয়ে ভাল গুণী আছে একজন, মাথার ব্যারামের সুন্দর চিকিৎসা জানে! তাকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে।

আজ কি বার?

বিষ্যুদ্‌বার!

দশমী ছিল সোমবার। সেই থেকে সে পাগল হয়ে ছিল আজ পর্য্যন্ত! শিবু জানায়, না, পাগল হয়ে সে থাকেনি। গুণীর ওষুধে ঘুমিয়েছে একটানা। মাঝে মাঝে দু-একবার অল্পক্ষণের জন্য জেগে আবোল-তাবোল কথা বলেছে, তারপর আবার ঘুমিয়েছে।

হালিয়া কত দূর এখান থেকে?

পাচ ছ' কোশ হবে।

তাকে শিবু পেয়েছিল এ গাঁয়ের কাছাকাছি, তখন মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। হালিয়া থেকে এত দূরে সে কি করে এসেছিল ওই অবস্থায় এ রহস্যের মীমাংসা নিখিল কোনদিন করতে পারেনি।

আমার মাথায় কি?

শিবু গর্বের সঙ্গে জানায়, ওই তো ওষুধ, গুণীর খাঁটি ওষুধ, হাতে হাতে ফল। মাথা নেড়া করে ওষুধ লাগিয়ে দেবার পর নিখিল ঘুমিয়ে ছিল, ঘুম যখন ভাঙ্গল মাথা তার ভাল হয়ে গেছে। নির্ঘাৎ ওষুধ নয়?

মাথা নেড়া করে দিয়েছে। তখনকার মত চুপ করে থাকে নিখিল! শিবুকে দিয়েই সহরে বাবার কাছে খবর পাঠায়। শিবুর বৌ দুধ গরম করে এনে দিলে এক চুমুকে দুধটাও শেষ করে। তারপর লোকজন নিয়ে

তার বাবা এসে পড়লে একটা মোটা কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে পাগলের মতই আথালি পাথালি পিটতে আরম্ভ করে শিবুকে।

শিবু তার বৌ আর গাঁয়ের সমবেত লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে পরম যত্নে রেখে একজনকে সুস্থ করে তোলার কি অপূর্ব পুরস্কার!

হ্যাংলা

বাজার সাপ্‌টে বড় লোক হয়েছে মীর্ণার বাবা, বালিগঞ্জে বাড়ী করেছে চমৎকার আর্টিষ্টিক ছাঁদে। সমস্ত বাড়ীটা নয়, কেবল সামনের অংশটা—বাইরের মানুষরা যে অংশে আসে এবং পথচারী রাস্তা থেকে যে অংশ দেখতে পায়। ভিতরের অন্দর মহলে চারমহলা দুর্গা-বাড়ীর পুরাণো ঐতিহ্য খানিকটা ভদ্র সাজ করে হাজির আছে।

মীর্ণার বাবা জবরদস্ত লোক। অনেক টাকা আছে বলে নয়, বাড়ী করা, মোটর কেনা, মেয়েকে তিনশো টাকায় শাড়ী কিনে দেওয়া প্রভৃতি দরকারী বিষয়ে ছাড়া কদাচ টাকার অপচয় করে না বলে। এমন কি, সামনে দোয়ানো দুধ ভালো হচ্ছে না বলে বাপ-বেটিতে মিলে গোয়ালাকে শাসাতে পর্য্যন্ত পারে বলে। যে ফার্ম্ম কণ্ট্রাক্ট নিয়ে বাড়ীটা তৈরী করেছিল তারা তাকে ঠকাতে সাহস করে নি। বিলামসন আর দাদভাই লালভাই দু'জনেরই সার্টিফিকেট দেখিয়েছিল। বিলামসনের বাড়ীর সাইত্রিশটা ফ্ল্যাটের প্রত্যেকটাতে আলো-বাতাস যায়, রাস্তা নজরে পড়ে! দাদাভাই লালভাইএর সাততলা বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশকে দেখতে পাওয়া যায় একটা লম্বা চোঙার ঢাকনির মত।

তাতে কাজ হয় নি। মীর্ণার বাবার আরও উঁচুতে প্রভাব।

সুলেখা, সুধা ও মীর্ণা এক কলেজে পড়ে। সুলেখা ও সুধা মিলের সাফ্ শাড়ী পরে কলেজে যায়। মীর্ণার তো রঙ-বেরঙের শ'তিনেক শাড়ী সর্ব্বদা মজুত আছেই—পুরাণো দু চারখানা বাতিল হতে না হতে নতুন পাঁচ-সাতখানা এসে জোটে। সুলেখা ইচ্ছে ক'রে দুবার এবং মীর্ণা অনিচ্ছায় একবার ফেল করায় সুধা প্রত্যেকবার পাশ করতে করতে এসে তাদের নাগাল ধরেছে।

সহরতলীতে সুলেখা ও সুধার বাড়ী, এক পাড়াতে এবং কাছাকাছি। দু'জনের একধরণের ভাব হয়েছে কিন্তু ঘনিষ্টতা জন্মে নি। সুলেখা বার বার ফেল করায় সুধা তাকে একটু নিকৃষ্ট জীব মনে করে। সুলেখা সর্ব্বদাই মৃদু মৃদু হাসি দিয়ে বেশী কথা বলার কাজটা চালিয়ে নিতে চায়, এটাও সুধার পছন্দ হয় না।

মীর্ণার নাগাল দু'জনেই পায় না। মীর্ণা নিজেকে ওদের নাগালের বাইরে রেখে দ্যায়। কলেজে দেখা হয়, কিন্তু না হয় দুটো মনের কথার বিনিময়, না জাগে এক সমতলে দাঁড়বার অনুভূতি। জমকালো দেহ এবং জমকালো শাড়ীতেও নির্ব্বোধ অহঙ্কার টলমল করে বলে মীর্ণা মাঝে মাঝে ছোট ছোট চোখ দুটির কুটিল দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে তাকায়। সস্তা মিলের শাড়ীর চেয়ে দামী সিল্কে যে মেয়েদের ভাল দেখায়, এই অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্যে মীর্ণার রীতিমত সন্দেহ উপস্থিত হয়।

মথুরামোহনের একটি খবরের কাগজ এবং একটি রাজনৈতিক দল আছে। সে নিজে এবং জনকয়েক অনুগত ছেলেমেয়ে এই নিয়ে তার দল এবং এতেই সে সন্তুষ্ট। কারণ, দলের গালভরা নাম, নিজের বক্তৃতার দাপট আর খবরের কাগজ, এতেই তার বেশ চলে যায়। হিসাব করে

নিজের রাজনৈতিক ওজনটুকু সে ধারও দেয়, ভাড়াও দেয়। সুধার সাহায্যে মথুরা মীর্ণাকে বাগিয়েছে। সুলেখাও হাত লাগিয়েছে কিন্তু সে একটু গভীর জলের মেয়ে। তার হস্তক্ষেপ ধরতে পারে নি বলেই মীর্ণার কল্পনায় সে-ই রং চড়াতে পেরেছে বেশী। মীর্ণা চড়বড় করে উপরে উঠে নেতৃ স্থানীয়া হযে দাঁড়িয়েছে অল্পদিনের মধ্যে। এখন সুধাকেই সে কাজের নির্দেশ দেয়। রীতিমত শক্ত কাজ—যাতে অনেক খাটা এবং হাঁটা দরকার। সুলেখাকে কয়েকবার কাজের শাস্তি দেবার চেষ্টাও সে করেছিল, স্বয়ং মথুরামোহনের জন্ম পারে নি।

'ও পারবে না। মেয়েটা কোন কাজের নয়।' মথুর যেন কৈফিয়ৎ দিয়েছিল।

'শিখতে হবে না?'

'কি দরকার? সকলকে বিশ্বাস করা যায় না।'

'ও!' বলে মৃদু হেসেছিল মীর্ণা!

সুধা খুব উৎসাহী। কোন কাজে সে কখনো না বলে না। সে জানে, ভাল ওয়ার্কার হিসাবে সে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে,। এটা বজায় রেখে চললে বড় রকম সুযোগ সুবিধা কোন দিক থেকে জুটে যাবে। শুধু মীর্ণার প্রতি গভীর বিদ্বেষে তার গা জ্বালা করে। ও কেন এত উঁচুতে স্থান পেল? মোটরে আসে যায়, বড়লোকের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেয, বাড়ীতে আজ পার্টি, কাল বসন্তোৎসব করে হাওয়ায় ভেসে দিন কাটায়। তাদের কখনো ডাকে না। তার সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করতে চায় না।

একদিন বিনা আহ্বানে সুধা ওর বাড়ী গিয়েছিল—সন্ধ্যাবেলা। ড্রয়িংরুমে পাঁচ সাতটি ছেলে মেয়ে বসেছিল, দু'তিন জন সুধার মুখচেনা। সুনীলের সঙ্গে তো তার আলাপ পর্য্যন্ত আছে। কাগজের অফিসে

একদিন অনেকক্ষণ সে তাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিল, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনে তার সমস্ত কথার জবাব দিয়েছিল সুনীল। আরেকদিন খুব অল্প সময়ের জন্য আলাপ হয়েছিল বটে কিন্তু সেদিন সুনীল রাজী হয়েছিল তার বাড়ীতে একদিন চা খেতে আসবে, গরীব বলে অবহেলা করবে না। তারপর সে আর সুনীলকে এ পর্য্যন্ত একটা দিন স্থির করে নিমন্ত্রণ করার সুযোগ পায় নি, কেমন যেন তাকে এড়িয়ে গেছে সুনীল। নিশ্চয় মীর্ণার কুপরামর্শে। কিন্তু মুটকী মীর্ণা ওকে আর কদিন ভুলিয়ে রাখতে পারবে. একদিন তার বাড়ীতেও নিশ্চয় আসবে চা খেতে।

কিন্তু সেই আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে আধ মিনিট তাকে মীর্ণা দাঁড়াতে দেয় নি, কারো সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে সোজা স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি চাই ?'

'এমনি আলাপ করতে এসেছি।'

'আরেকদিন এসো।'

আরেক দিন এসো! অপমানে বুক ফেটে গিয়েছিল সুধার। কেন আরেকদিন আসবে ? আজ তাকে সকলের মধ্যে বসিয়ে চা আর ওই খাবারগুলির কিছু খেতে দিলে দোষ কি হত ?

আঘাতটা সামলে নিয়ে পরে সুধা মনে মনে হেসেছে। ওরা ওই রকমই হয়। ওরা বড়লোকের জাত—বজ্জাত। ওদের দিয়ে সমাজের কোন কল্যাণ হতে পারে ?

সুলেখা বলে, 'তোমার অত হিংসা কেন ? তুমি তোমার কাজ করে যাও।'

'আমাদের মানুষ বলে গণ্য করবে না ?'

'নাইবা করল? আমরাও ওকে মানুষ বলে গণ্য করব না। তাছাড়া, ওকে মথুরাবাবুর তেমন পছন্দ নয়।'

'নয়?' সুধা চমকে যায়।

সুধা কাজ করে, খুব ভাল কাজ করে। প্রতিদিন বিকালে সে তাদের আপিসে হাজির থাকে। বই পড়ে, অন্য ওয়ার্কারদের সঙ্গে কথা বলে আর উৎসুক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে কে আসছে আর কে যাচ্ছে। হঠাৎ একসময় সে একজনের পিছু পিছু বেরিয়ে যায়। রাস্তায় নাগাল ধরে বলে, 'বাড়ী যাবেন নাকি মোহন দা?'

মোহন বিব্রত হয়ে বলে, 'এঁ্যা? হ্যাঁ, বাড়ীই যাব ভাবছি।'

'চলুন আপনার সঙ্গে ভবানীপুর পর্যান্ত যাওয়া যাক। পরিচয়টা আরও জমবে।'

'চলুন।'

'অবিশ্যি যদি আমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসেন।'

মোহন ধীরে ধীরে বলে, 'বাড়ীতে একটু কাজ ছিল।'

এসপ্লেনেডে ট্রাম বদল করতে নেমে সুধা বিস্ময়কর স্বগতোক্তি করে, 'ওই যা, ভুলে গেলাম। সর্দ্দি হয়েছে, একটু কফি খেয়ে যাব ভেবেছিলাম। কলেজ থেকে বেরিয়ে কিছু খাইনি—খিদেও পেয়েছে চন চনে।... ... খাওয়াবেন তো বুঝলাম, আপনিও খাবেন তো?'

তা, বাড়ীর অবস্থা সুধার তেমন ভাল নয়। কলেজের পর খিদে পেলে সস্তা কিছু খেয়ে কোনরকমে পেট ভরাতে পারে—তাতে স্বাদ নেই, গন্ধ নেই, পুরুষ একজন সঙ্গীকে নিয়ে পাখার নীচে ভাল চেয়ারে গা এলিয়ে খাবার সুখ নেই।

সুলেখা বলল, 'এসব বাদ দে ভাই।'

সুধা বলল, 'তুই বড় হিংসুটি। ডেকে নিয়ে যায় তো আমি কি করব? বেশী প্রশ্রয় তো দিই না।'

তলে তলে কি চাল চালল সুলেখা সেই জানে, কদিন পরে মীর্ণা নিজেই সুধার কাছে প্রস্তাব করল, তার ছোট বোনকে সে যদি পড়ায়, ত্রিশ টাকা করে সে পাবে।

'সকালে একঘণ্টা আর বিকেলে একঘণ্টা। বাড়ী তোমার কাছেই, অসুবিধে হবে না। নিয়ম মত মনযোগ দিয়ে কিন্তু পড়াতে হবে। মথুরা বাবু তোমার কথা বললেন তাই, নইলে—'

তিরিশ টাকা! মাসে শুধু তিরিশটা টাকা দুবেলা পড়ানোর জন্য! এত টাকা খরচ করে মীর্ণা, তাকে পঞ্চাশ না হোক চল্লিশটা টাকা মাইনে দিতে পারে না সে! মরুক গে, তিরিশ টাকাই সই। দু'একখানা শাড়ী কেনা যাবে, হাত খরচের কটা টাকা বেশী হবে—'

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর মীর্ণার ছোট বোনকে সে অতি কষ্টে পড়াচ্ছে, বাড়ীর সামনে মোটরের পর মোটর এসে থামতে লাগল। আরও মিনিট কুড়ি পড়িয়ে মীর্ণার ঘরে গিয়ে মুখে পাউডার লাগিয়ে সে সোজা গিয়ে হাজির হল বসবার ঘরে। চেনা আধচেনা কয়েক জনের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করে সুনীলের পাশের আসনে বসে পড়ল।

'কই চা খেতে একদিন তো গেলেন না গরীবের বাড়ী?'

পরদিন সন্ধ্যার পর সুলেখা কয়েকটা সরু গলিতে পাক দিয়ে একটি বাড়ীতে ঢুকে পড়ল। প্রেসে ছাপার কাজ চলবার দেয়াল-কাঁপান শব্দ হচ্ছিল। ছোট একখানা ঘরে কাঠের টেবিলের সামনে একটি হাতল-

ভাঙা কাঠের চেয়ারে বসে মাঝ-বয়সী একজন প্রুফ দেখছিলেন। তাকে কাগজ, মেঝেতে কাগজ, চারিদিকে কাগজের ছড়াছড়ি! খবরের কাগজের অপিসের গন্ধে ঘরের বাতাস ভরা। মুখ তুলে একবার চেয়েই মথুরা বলে, 'বোসো। কি খবর?'

'সুধার খবর।'

'কি রকম দাঁড়ালো?'

'হ্যাংলা।'

মুখ না তুলে গলায় বিস্ময় না ফুটিয়ে মথুরা বললেন 'হ্যাংলা? এসব মেয়ে ক'জন হ্যাংলা বেরোয় শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ছেড়ে দাও ওকে।'

'আমায় টাকাটা দিতে পারবেন আজ?'

'টাকা?'

এবার মাথা তুলে মথুরা আর নামাল না—'মীর্ণা টাকাটা দিচ্ছেনা। ওর টাকাটা আদায় করিয়ে দাও, ডবল কমিশন দেব। সহজে হবে না, চাপ দিতে হবে। কি করবে বলে দিচ্ছি। সবাই যেন একটু অবহেলার ভাব দেখায়। কথা বলতে আরম্ভ করলে কান না দিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা চালাতে হবে। ওয়ার্কাররাও যেন ডাকলে সাড়া না দিয়ে সরে যায়। দু'চার জন আসছি বলে চলে যাবে, আসবে না। মীর্ণা যেন বুঝতে পারে কাগজের টাকাটা তাড়াতাড়ি দেওয়া চাই। বুঝিয়ে বলে দিও সকলকে!'

প্রুফ দেখতে আরম্ভ করে বললেন, 'চা খাবে নাকি একটু? আমায় কিন্তু এক কাপ দিও।'

দিন তিনেক পরে বাপের কাছে একটা চেক চেয়ে নিয়ে মীর্ণা বলে, 'তোমার ওই মথুর বাবু বড় হ্যাংলা বাবা।'

বাগ্দী পাড়া দিয়ে

ভর দুপুরে দুলে বাগ্দী নায়েবমশাই শ্রীমন্ত সরকারের ঘরের দাওয়ায় সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসে আছে। ছেলের মত যত্নে পাশে তার পাকা বাঁশের লাঠিটি শোয়ানো। কত তেল আর কত স্নেহে পাকানো এই লাঠি, রক্তও যে মাখেনি কত্তাবাবুর হুকুমে বিদ্রোহী প্রজার মাথা ফাটিয়ে এমন নয়।

লাঠিটি হাতে নিয়ে দুলে সকালবেলা বাগ্দীপাড়া থেকে বেরিয়েছিল। কাছারীবাড়ী গিয়েছিল কত্তাবাবুকেই তার দুঃখ আর নালিশ জানাতে। জমিদার অনুকুল তার নিবেদন কানেও তোলে নি, তার গুরুতর কিছু বলার আছে টের পেয়েই হুকুম দিয়েছিল; শ্রীমন্তর কাছে যা দুলে। যা বলতে চাস শ্রীমন্তকে বল। পরে আমি শুনব'খন।

শ্রীমন্ত বলেছিল, কিরে দুলে! বুড়ো বয়সে আবার কোন ছুঁড়ির সাথে 'অঙ' (রং) করে ফ্যাসাদে পড়েছিস নাকি? এখন বাবু আমি বড় ব্যস্ত। আমার বাড়ী যা, পূবের বেড়াটা একটু ভেঙ্গে গেছে সেরে দিবি যা ততক্ষণ। কাছারির কাজ সেরে আসছি, তোর নালিশ শুনব।

পূবের গাছের মাথা ঘেঁষা সূর্য্য মাথার উপরে চড়া পর্য্যন্ত দুলে নায়েবাবুর বাড়ীতে বেগার খেটেছে, বাগানের বেড়া সারিয়েছে। অন্য বাড়ী চুক্তি করে নিলে এ কাজের জন্য সে কম করে আট আনা মজুরি পেত। কিন্তু বেলগাছে দেবতা থাকেন দুলের, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান এবং সেইজন্যই দুলে বাগ্দীপাড়ায় প্রধান। ওই বেলগাছের দেবতা বা দৈত্যকে সে মানে বলেই জমিদার আর নায়েব গোমস্তা তাকে পায়ের গোলাম হতে দিয়েছে, বাগ্দীপাড়ার প্রধান করেছে। বেগার তাকে

খাটতেই হবে। শুধু তাকে কেন, বাগ্দীপাড়ার সব মদ্দপুরুষকে খাটতে হবে।

অনেক বেলায় বাড়ী ফিরে শ্রীমন্ত বলেছিল, একটু বোস বাবা। চট করে নেয়ে খেয়ে নি, তারপর তোর নালিশ শুনব। তোদের ভাল করতে হারামজাদা আমি যে মারা গেলাম!

দুলে সেই থেকে দাওযায় বসে আছে। মাঝ-দিনের মাথার উপরের সূর্য্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে চলতে আরম্ভ করেছে। তবু নীরবে বিনা প্রতিবাদে অপেক্ষা না করে তার উপায় কি। গ্রামের বাইরে যেখানে গোল হয়ে বাঁক নিয়েছে নদী সেইখানে ঘন বাঁশঝাড় জলা জঙ্গল ভরা জমিতে বাগ্দীপাড়া, সে পাড়ায় সে প্রধান। সেটা তো বেলগাছের দেবতা, জমিদার আর নায়েব বাবুর দয়াতে। তার রাজ্যে, ওই বাগ্দী পাড়ায়, আজ যখন বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তার যখন খটকা লেগেছে ব্রাহ্মণ জমিদার নায়েব ভগবান ইংরেজরাজ তাকে আর কতদিন প্রধান করে রাখতে পারবে, তখন এভাবে শ্রীমন্তর বাড়ী এসে বেগার খেটে ধন্না না দিয়ে তার উপায় কি। তার রাজ্য যে যায় যায়।

কষ্টে তার মাথা ঘুরছে। আধেক দিন প্রতীক্ষা করাল, আধবেলার বেশী বেগার খাটাল, একমুঠো গুড়মুড়ি জল খেতে দেয় নি। বেলগাছের দেবতার মতই এরা নিষ্ঠুর। আহা, নিষ্ঠুর বলে অত্যাচারী বলেই তো এরা দেবতা! তাই হবে!

ভুঁড়িতে আলগা করে লুঙ্গি আটকে হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্ত এসে জলচৌকিটাতে ধপাস করে বসে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, চটপট বল দিকি কি ব্যাপার। প্যানাস নি, এক কথায় বল। তোদের নালিশ শুনতে শুনতে প্রাণ বেরিয়ে গেল, হারামজাদা বজ্জাতের দল। ঘুম পেয়েছে বাবু আমার।

ঘরের ভেতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে দুলে দুলে ঘুমপাড়ানি ছড়া শোনে—

আয় রে ঘুম যায় রে ঘুম
বাগ্দী পাড়া দিয়ে,
বাগ্দীদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে—

তবে তুমি ঘুমোবে যাও। নালিশ শুনে কাজ নেই।

শোয়ানো লাঠি হাতে তুলে দুলে উঠতে যাবে, ব্যাপার বুঝে সচেতন হয়ে শ্রীমন্ত হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি গলায় বলে রাগিস কেন? তুই আর আমি কি তফাৎ? তুই আমার পুত্রতুল্য! কি বলছিস বল।

বলব কি? দারুণ অভিমানে লাঠি আবার শুইয়ে রেখে হাত জোড় করে দুলে বলে, একদল বদ বেজাত যারা কারখানায় কাজ করতে যায় না? বাগ্দী-পাড়া ওরা নষ্টাৎ করে দিচ্ছে। কি বলে শুনবে?

বল না শুনি।

বলে, মোরাও মানুষ। রাজা মানুষ, দেবতা মানুষ, বাবুলোক মানুষ, মোরাও মানুষ।

বলে তো হয়েছে কি?

হয়েছে কি? ঠাকুরথানের বাঁধ কাটতে চায়, এই হয়েছে! ঠাকুরথানের অপমানের কথা উচ্চারণ করার জন্যই নিজের দু'কান মলে দুলে শিউরে ওঠে।

বলিস কিরে! কবে কাটবে?

অনেকে গুঁইগাঁই করছে, তাইতে হঠাৎ ভরসা পাচ্ছে না, নইলে কবে কেটে দিত। তবে রাতদিন জপাচ্ছে, ইয়াকে উয়াকে রাজী করাচ্ছে। বেশীদিন আর সামলান যাবে মোর ভরসা নাই। তোমরা ইবারে বিহিত করণ

বাগ্দীপাড়া জলার কাছে, প্রায় জলার মধ্যে। প্রতি বছর বর্ষায় জল

পাড়ায় ওঠে, আবদ্ধ জল পচতে পচতে এক আঙ্গুল দেড় আঙ্গুল সরতে সরতে আরেক বর্ষার আগে শুধু কিছুদূর তফাতে সরে যায় মাত্র। নীচু জমির স্বাভাবিক জলা, চারিদিকে জমি উঁচু, জলা ওখানে থাকবেই। পশ্চিমে জমি শুধু একটু কম উঁচু—আগে, বহুকাল আগে, ওইদিক দিয়ে জলার কিছু বাড়তি জল বেরিয়ে যেত, বর্ষার জল একেবারে পাড়া পর্য্যন্ত উঠত না। বহুকাল আগে, কতকাল আগে কারো আজ স্মরণ নেই, এক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী পশ্চিম দিকে একযাগায় হাত ত্রিশেক লম্বা, দশ বারো হাত চওড়া এবং পাঁচ ছ' হাত উঁচু একটি বেদী বানায়, ইঁট আর মাটি দিয়ে। তার নাকি স্বপ্নাদেশ হয় যে বাগ্দী সমাজের চিরদিনের কল্যাণের জন্ম ওখানে শিবাই ঠাকুরের বেদী স্থাপন করতে হবে। এবং এমনি আশ্চর্য্য ব্যাপার, স্বপ্নাবেশের খবর শোনামাত্র জমিদার টাকা আর লোক দিয়ে নিজেই বেদীটা বানিয়ে দেয়। মহাসমারোহে বেদীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয়, বাগ্দীদের মধ্যে নেশা উত্তেজনা আর উল্লাসের সীমা পরিসীমা থাকে না। সেই থেকে ওই ঠাকুরের থান তাদের সমস্ত ধর্মকর্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এবং সেই থেকে বর্ষাকালে জলার বাড়তি জল ঠাকুরের থান ডিঙ্গিয়ে যেতে না পেরে পাড়ার মধ্যে ঘরের মধ্যে ঢুকতে সুরু করেছে।

শ্রীমন্তের কিঞ্চিৎ আগ্রহ জাগে, হাই তুলে বলে, কি বলে জপাচ্ছে? ঠাকুরের থান তো বেগার খাটা তেভাগা নয়?

জুলে তার ঝাঁকড়া চুল পিছন দিকে ঠেলে দেয়। চুলে তার কটা রং ধরেছে, বিশেষ পালপার্ব্বণে কদাচিৎ একটু তেল পড়ে। চুলে অসংখ্য উকুনের বাসা, মাঝে মাঝে যখন সে পাগলের মত মাথা চুলকায় তখন মনে হয় রাগে বুঝি নিজের চুল ছিঁড়ছে, বাগ্দীপাড়ার অবাধ্যতার রাগে!

শোন তবে কি বলে। পাপ কথা মুখে উচ্চারণ করতি মোর গা কাঁপে। বলে মোরা খাটি খাই, মোরা ছোট কিসে, মোরা সজ্জাত হব। মোরা বজ্জাতি ধরম করম মানবো নাই।

সজ্জাত কি রে?

ঠাকুরমশাইরা তোমরা বাবুরা যে জাত, তার চেয়ে উঁচু জাত, ভাল জাত।

ও, সৎ জাত। উঁচু জাত।

দুলে মাথা হেলিয়ে সায় দেয়।—হাঁ সজ্জাত। বলে, বজ্জাও সংসার পাল্টে গেছে, বামুনের চেয়ে সেরা জাত এয়েছে পিথিমিতে, মজুরের জাত, খাটিয়ের জাত। যে খাটবে সে জাতের লোক, ব্যাস। আর সব বেজাত বজ্জাত। কেন? না, তারা চোর ছ্যাচোর। কেন? না বাবা খাটে তাদের অন্ন চুরি করে খায়। চোর বেজাতের দেব্‌তা ধরম মোরা মানি না, মোরা সজ্জাত।

বলতে বলতে দুলে বাগ্দী কেঁদে ফেলে, কুলি খাটা ছোঁড়াছুঁড়ি মোষ পাড়া সমাজ বেদখল করলে গো! তুমরা এর বিহিত কর!

ভাত খেয়ে তামাক টানতে টানতে শ্রীমন্তের ঢুল আসছিল। বাগ্দী পাড়ায় আবার বিদ্রোহ! যোয়ানদের মধ্যে কিছুটা বেয়াদপি বেড়েছে এই পর্য্যন্ত, দুটো গুঁতো খেলে ঢিট্ হয়ে যাবে। সমাজের মাতব্বরকে সবাই মেনে চলবে এটা উচিত এবং দরকার। মাতব্বর নিজে অনুগত থাকে, দশজনকে অনুগত রাখে। দশজনকে বশে রাখার যোগ্যতাও অবশ্য মাতব্বরের কিছুটা থাকা দরকার।

শ্রীমন্ত ধমকে বলে, কাঁদিস না ব্যাটা, মেয়েছেলের মত কাঁদতে লেগেছে! সাধে কি তোকে কেউ মানে না?

দুলে ভাবাবেগ সামলে মাথা উঁচু করে গর্ব্বের সঙ্গে বলে, তোমরা

হলে মা বাপ, তোমাদের ঠেঁয়ে কাঁদতে পারি। না তো ছুলে বাগ্দী কেমন মরদ দশটা গাঁয়ের মানুষ জানে।

শ্রীমন্ত ব্যঙ্গ করে বলে, মরদ যদি তো ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিতে পারিস না ব্যাটা ?

উই তো মোর পোড়া কপাল! হাউমাউ করে ওঠে ছুলে, তোমরা বুঝবে নি। ই যে সামাজিক অমান্তি গো, জেতের ব্যাপার, ঠেঙ্গাব কাকে ?

সামাজিক বৈঠক ডেকে বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করাব চেষ্টা কি আর করে নি ছুলে কিন্তু কে মানছে বিচার, কে মাথা পেতে নিচ্ছে শাস্তি ? যাদের জাতে ঠেলবে একঘরে করবে তারাই যে বর্জ্জন করেছে যে ক'জন ছুলের পক্ষে আছে তাদের। খুঁটিতে বেঁধে যে ঠেঙ্গাবে, মাথা মুড়োবে, ছ্যাকা দেবে, তার উপায কই ? ওরাই যে উল্টে তাদের পিটিয়ে দেবার মত দলে ভারি। ছুলে বরং জাত ধর্ম ঠাকুর দেবতা চিরকালের রীতিনীতির কথা বুঝিয়ে বুঝিযে, কারণে অকারণে পচাই-খাওয়া সামাজিক পরব-ফুর্ত্তির ব্যবস্থা করে, তাতে মেযেমদ্দর মেলামেশার নীতিনিযম আরও শিথিল করে কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। নইলে সব চুরমার হয়ে যেত এতদিনে। কিন্তু—

মোর আর খ্যেমতা নাই। ইবারে তোমরা বিহিত কর !

শ্রীমন্তর আবার ঢুল আসছিল। সে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা। কে কে পাণ্ডা নাম বলত। বিশে শিবু ?—

উপরে ভাদ্র শেষের মাথা ফাটা রোদ, তলায় বর্ষায় পরিপূর্ণ জলা-পুকুর ভিজে মাটি থেকে গরম ভাপ উঠছে। বাগ্দীপাড়ার দিকে চলতে চলতে ভুসে হিংসার আনন্দে চোখে প্রায় ঝাপ্সা দেখতে থাকে। হোক বিহিত, চরম বিহিত হোক। তার প্রতিপত্তি তার অধিকার নষ্ট হবার বদলে

বাগ্দীপাড়াটাই যদি আগুনে পুড়ে যায়, বাগ্দী জাতটাই ধ্বংস হয়ে যায়, তাতেও তুলের আপত্তি নেই! তার দেবতা অপদেবতাদের কাছে তুলে মাথা কপাল খুঁড়ে প্রার্থনা জানায়। বলি মানত করে।

বাগ্দীপাড়ার জলকাদা শীতকালের আগে শুকোয় না, শুকোবার আগে পচে যায়। গ্রামের বাইরে নীচু জমিতে তাদের কুঁড়ে বাঁধবার ঠাঁই, সাধ করে মানুষ সেখানে থাকে না। গোড়ায় রাজা জমিদারের প্রজা-ঠেঙানো লেঠেল-পুলিশী আর বেগারদারির বিনিময়ে সামান্য জমি পেয়েছিল, একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। লাঠি মাঝে মাঝে আজও ধরে, তবে পেশা হিসাবে তুচ্ছ হয়ে গেছে। জমির টুকরো নানাভাবে খসে গেছে, বৃত্তির বদলে পূজাপার্ব্বণে চিঁড়ে-মণ্ডা সিধে পায় কিন্তু রীতি হিসাবে বেগারখাটা ঠিক বজায় রয়ে গেছে। আর আছে তাদের দুর্দ্ধর্ষ বন্য ও বোকা করে রাখার জন্য খাওয়া-পরা চলা-ফেরা ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাজ-গড়া ইত্যাদি ব্যাপারে যে সব বর্ব্বর রীতিনীতি ব্যবস্থা চাপানো হয়েছিল তার অবশিষ্ট পরিশিষ্ট।

আছে মানে এই সেদিনও ছিল, যুদ্ধের বাস্তব ধাক্কায় এখন যায় যায় অবস্থা। কাছাকাছি যুদ্ধকালীন কারখানা বসায় ধাক্কাটা লেগেছে প্রচণ্ডভাবে, জীবিকার তাগিদে বুড়ো আর মাতব্বরের বাধা নিষেধ অমান্য করে কারখানায় খাটতে গিয়ে অনেকে হয়ে এসেছে সমাজ-ভাঙা বোমা। নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত অল্পদিনে কি অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারের বন্ধ পশুগুলি! তারা মাতিয়ে দিয়েছে বাগ্দীপাড়ার পচাই খাওয়া মেয়ে পুরুষকে, যথেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণের ছায়া-ভীরু অপদেবতার আতঙ্কে বিহ্বল মারামারিতে পটু ক্ষেতমজুর জেলে মাঝি চাটাই-বোনা ঘরামি-খাটা বাগ্দাদের। উঁচুতলার মানুষের আচার নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি

ভোগের ফলে এতদিন যা ছিল তাদের বর্ব্বরতার পাশবিক সাহস—লাঠি হাতে খুন করতে খুন হতে ভয় না পাওয়া—চেতনার ছোঁয়াচ লাগা মাত্র তা পরিণত হতে আরম্ভ করেছে তেজে, মুক্তি কামনায়।

এই তেজের প্রমাণ ভুলে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রচণ্ড রোদে শতাধিক বাগ্দী মেয়ে পুরুষ কোদাল খন্তা নিয়ে ঠাকুরের থান খুঁড়ছে—এক পাশে চার পাঁচ হাত চওড়া সুড়ঙ্গ কাটছে বেদীতে।

একি দুঃস্বপ্ন দেখালে ঠাকুর? একি সর্ব্বনাশ ঘটালে? বাগ্দী সমাজের বিদ্রোহ দমনের বিহিত করতে এক সকাল সে কত্তাবাড়ী আর নায়েববাবুর বাড়ী ধন্না দিয়েছে, তার মধ্যে জগৎ ওলট পালট হয়ে গেল? অপরাধ কি হয়েছে কোন? ঠাকুরের থানে ধন্না দিতে সে ত কসুর করেনি, হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে তার যখন মনে হয়েছে ঠাকুর নিজে ফিস ফিস করে শিস্ দিয়ে আদেশ দিলেন কত্তাবাবুর কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে যাওয়ার জন্য, শুধু তখনই তো সে ওদিকে ধন্না দিতে গিয়েছে।

উন্মাদের মত ছুটে গিয়ে ভুলে চীৎকার করে: সব্বোনাশ হবে, সব্বোনাশ হবে! ঠাকুরের থানে কোদাল ছোঁয়ালি?

শিবু কোদাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, বাবুদের ঠাকুর ঘরে নালা থাকে। মোরা একটা জল নিকেশের নালা করে দিচ্ছি। ঠাকুরের থান তোমার ঠিক রইবে।

পালা! পালা সব! কত্তাবাবুকে খবর দিয়ে এয়েছি, পুলিশ আসছে, মিলিটারী আসছে। পালা, পালা, সব পালা!

মাটির মাশুল

সকলে এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়।

দুলালী কচি বয়সে কারখানায় খাটতে গিয়ে জাত-ধর্ম সব নষ্ট করেছে। উথলে উঠেছে তার যৌবন। খন্তা হাতে এগিয়ে গিয়ে সে বলে, আরে বুড়া তোর মরন নাই? খপর দিছিস?

খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে। রক্তে তার রুক্ষ কটা চুলে চাপ চাপ জটা বাঁধতে থাকে। ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ্ধ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।

সমাপ্ত